শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে

শিবদাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে — শিবদাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৭৬
সপ্তম মুদ্রণ ঃ ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
অষ্টম মুদ্রণ ঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ (০৩৩) ২২৪৯ ১৮২৮, (০৩৩) ২২৬৫ ৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ২০ টাকা

প্রকাশকের কথা

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, এ আই ইউ টি ইউ সি-র সভাপতি প্রয়াত কমরেড শিবদাস ঘোষ অর্থনীতিবাদ, সুবিধাবাদ এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির বিভিন্ন ধারা, যা আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের গভীর অনুপ্রবেশ করেছে, তার বিরুদ্ধে আজীবন নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের সঠিক বৈপ্লবিক দিশা দিয়েছেন। শ্রমিক আন্দোলনকে সর্বহারা শ্রেণীর উন্নত রুচি সংস্কৃতি ও নীতি নৈতিকতার আধারে গড়ে তুলতে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

বর্তমান পুস্তিকায় কমরেড শিবদাস ঘোষের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কিত তিনটি ভাষণ প্রকাশ করা হল। প্রথমটি ১৯৬৭ সালের ১৪ মে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণ। শোষিত শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থে তৎকালীন পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রগতিশীল শ্রমনীতির যথার্থ বৈপ্লবিক তাৎপর্য কী ছিল এবং এই প্রগতিশীল শ্রমনীতির সুযোগে কী ধরনের আন্দোলন দ্রুত শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত করা প্রয়োজন ছিল, সে সম্পর্কে একটি অত্যন্ত শিক্ষামূলক বিশ্লেষণ ঐ সময়ে তিনি তুলে ধরেন। এই বক্তৃতায় বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের মৌলিক বৈষম্যের চরিত্র, প্রগতিশীল শ্রমনীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও মালিকশ্রেণীর সম্মিলিত আক্রমণের কারণ, শ্রমিক আন্দোলনে মূল রাজনৈতিক চেতনাবিহীন অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের প্রভাব, বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা — এগুলির চরিত্র এবং তার থেকে মুক্তির পথ কী, তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন। ভাষণটি ১৯৬৭ সালে 'ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক সম্মেলনে কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণ' নামে প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়। ১৯৯৩ সালে বইটির নাম পরিবর্তন করে 'শ্রমিক আন্দোলনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে' করা হয়। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে ভাষণটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষণটি ১৯৭৪ সালের ১৭ ও ১৮ মার্চ ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম বার্ষিক

সম্মেলনের প্রকাশ্য ও প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণ। এই দু'টি ভাষণের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে এবং বিপ্লবী গণআন্দোলন ও বিপ্লবী শ্রমিক তথা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের উন্নত নীতি নৈতিকতা ও আচরণ সম্পর্কে অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ তিনি তুলে ধরেন। এই ভাষণ তিনটি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও শ্রমিক ভাইয়ের কাছে পথনির্দেশক দলিল হিসাবে পরিগণিত হবে। প্রকাশ্য অধিবেশনের ভাষণটি নির্বাচিত রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে "শ্রমিকের কাছে সর্বহারা রুচি সংস্কৃতি তুলে ধরতে হবে" এই নামে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রতিনিধি অধিবেশনের ভাষণটি "শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য রক্ষা ও বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে" নামে ২০১০ সালে প্রকাশিত নির্বাচিত রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে এই তিনটি মূল্যবান ভাষণ একত্রিত করে ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে "শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে" নামে প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সেই পুস্তিকার অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশ করা হল।

৪৮, লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩
২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

শ্রমিক আন্দোলনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে

১৯৬৭ সালে জনগণের রায়ে পশ্চিমবঙ্গে বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় তা হচ্ছে — বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি জনমুখী সরকারের ক্ষেত্রে শাসন পরিচালনার নির্ধারক নীতি কী হবে। এস ইউ সি আই-এর সুদৃঢ় প্রস্তাব ও চাপের ফলে এই যুক্তফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল — "ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ চলবে না।" এরই অনুসরণে শ্রমনীতি ঘোষণা করে বলা হয়েছিল — ন্যায়সঙ্গত শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, সি পি আই(এম) সহ যুক্তফ্রন্টের আরও কয়েকটি শরিক দল এই নীতির তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে সংকীর্ণ স্বার্থে তার অপব্যবহার ঘটায়, যার ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সামনে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই পটভূমিকায় সরকার গঠনের কয়েক মাস পরে, পশ্চিমবঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রদত্ত এই ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী এই শ্রমনীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দেখান যে, এর উদ্দেশ্য হ'ল গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামগুলিকে পুঁজিবাদ উৎখাতের অন্তিম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া — যাতে করে এর মধ্য দিয়ে সমগ্র দুনিয়ার বাম গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কাছে এমন এক বুনিয়াদি সঞ্চালক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা যায় — যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে একটি প্রকৃত জনমুখী সরকারকে পথ দেখাতে পারে যাতে সে সরকারি ক্ষমতার যথাযথ সদ্ব্যবহার করে জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলিকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করতে পারে এবং সেগুলি গড়ে ওঠার ও বিকাশের ব্যাপকতম সুযোগ করে দিতে

পারে। ভাষণ প্রসঙ্গে কমরেড ঘোষ এটাও দেখান যে, এই নীতি গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর উপর নতুন দায়িত্বও বর্তেছে। আজ তাদের অতি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, এই নীতির ফলে একটি বিপ্লবাত্মক সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীকে তাই সঠিক রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং সংগ্রামকে অর্থনীতিবাদ, কানুনি জটিলতা ও সংস্কারবাদের সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে।

কমরেড সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক ভাইসব ও উপস্থিত বন্ধুগণ,

আজকের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এই বার্ষিক সম্মেলনে আমাকে কিছু বলবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার পর যে প্রগতিশীল শ্রমনীতি গ্রহণ করেছে, বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পটভূমিকায় তার যথার্থ তাৎপর্য এবং সাধারণ মানুষ বিশেষ করে খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের সামনে এই অবস্থায় কী করণীয়, সে সম্পর্কে আমি এই সম্মেলনে আপনাদের সামনে সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করব।

প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, এরকম জাঁকজমক করে সম্মেলন আগেও হয়েছে, এর চেয়ে বড় আকারেও হয়েছে, বহু প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। নেতাদের বক্তৃতা শুনে অনেক হাততালি আপনারা দিয়েছেন, উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন, সংগঠনের মনোভাব, লড়াইয়ের দৃঢ়সংকল্প বহুবার বহুরকমভাবে আপনারা ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের সম্মেলন, দাবিদাওয়া আদায় নিয়ে লড়াই আপনারা বহুদিন যাবৎ করে আসছেন। আপনাদের ত্যাগ করবার, লড়াই করবার যে শক্তি-সামর্থ্য আছে তাও আপনারা অনেকবার দেখিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের অবস্থা পূর্বে যা ছিল, এত সব কাণ্ডের পরেও মূলত তাই আছে, বিশেষ কিছু পাল্টায়নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হওয়ার পূর্বে শোষণব্যবস্থার চাপে পিষ্ট যে শ্রমিক আপনারা ছিলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও তার প্রগতিশীল শ্রমনীতি প্রভৃতি সত্ত্বেও আপনারা সেই শোষিত, অত্যাচারিত শ্রমিকশ্রেণীই আছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথচ মালিকশ্রেণী নেই, তাদের শোষণ নেই, জুলুম নেই, ছাঁটাই নেই, লে-অফ নেই, কোনও অত্যাচার নেই, চাকরির অনিশ্চয়তা নেই — অবস্থাটা কি এরকম? যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কি এসব পাল্টে গিয়েছে, না পাল্টে যাওয়া সম্ভব?

এতদিন পর্যন্ত আপনাদের ধারণা ছিল, বা আপনাদের মধ্যে ধারণা সঞ্চারিত

করা হয়েছে এবং আজও করা হচ্ছে যে, এদেশে যখন 'অ্যাডাল্ট ফ্রেঞ্চাইস' (প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার) অর্থাৎ আপনাদের ভোট দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তখন আর বিপ্লবের প্রয়োজন কী? কংগ্রেসিরা, পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের তাঁবেদাররা এবং ইলেকশন রাজনীতির প্রভাবে মোহগ্রস্ত একদল লোক ক্রমাগত আপনাদের বিচারবুদ্ধিকে বিপথে পরিচালিত করার হীন উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রচার করে থাকে যে, যেহেতু জনসাধারণের ভোটের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং ভোটের মাধ্যমে ইচ্ছা করলেই যেখানে জনসাধারণ মনোমতো সরকার গঠন করতে পারে এবং সেই সরকারের জনস্বার্থের অনুকূলে প্রয়োজনমতো আইনকানুন পাল্টাবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে;পুলিশ, মিলিটারি, ব্যুরোক্রেসি প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্থায়ী শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামগুলি গড়ে তোলবার কোন সার্থকতা নেই, বিপ্লবী মতাদর্শের প্রয়োজনীয়তা নাকি আর নেই। এই কথাগুলো পুঁজিপতিশ্রেণীর দালালরা নিয়ত আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করছে। ওরা প্রচার করছে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার থাকা সত্ত্বেও যারা বিপ্লবের কথা বলে তারা নাকি অহেতুক দেশের অভ্যন্তরে একটা গৃহযুদ্ধ বাধাতে চায়, দেশের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায়, দেশের অব্যাহত অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করতে চায় — বিদেশি বুক্নি, বিদেশি তত্ত্ব, বিদেশি বুলির ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়। আর এইসব যারা করতে চায় তারাই নাকি বিপ্লবের কথা বলে। এটা একটা ডাহা মিথ্যা। এই সব বক্তব্যের আড়ালে যে আসল সত্যটিকে জনসাধারণের সামনে চেপে রাখবার চেষ্টা প্রতিক্রিয়াশীলরা করে থাকে আজ সেই সত্যটিকে আপনাদের উদ্‌ঘাটিত করতে হবে, এই মিথ্যা প্রচারের মুখোশ আপনাদের খুলে দিতে হবে। আজ যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার মধ্য দিয়ে এই ধরনের প্রচার যে কতবড় ধোঁকাবাজি এবং মিথ্যাচার বাস্তবে তা প্রমাণ হতে চলেছে। এই কথাগুলো সত্য অথবা মিথ্যা তার একটা বাস্তব পরীক্ষা হচ্ছে আজকের নতুন পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আমি দেখাতে চাইছি, এই তো আপনাদের মনোমতো যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার গঠন হওয়ার ফলে কি আপনাদের জীবনের মূল সমস্যা যেগুলো ছিল তা দূর হয়ে গেছে, নাকি এই সরকারের পক্ষে ইচ্ছে থাকলেই শুধু আইন পাল্টে সেই সমস্ত মূল সমস্যা দূর করে দেওয়া সম্ভব? আপনাদের বোঝা উচিত যে তা সম্ভব নয়। তাহলে কি শ্রমিকদের স্বার্থে এই যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের কোন তাৎপর্য নেই? আমি মনে করি আছে। পুঁজিবাদী সংবিধান ও আইনের পৃষ্ঠপোষকতায় মালিকশ্রেণীর যে শোষণ ও অত্যাচার অব্যাহত গতিতে চলছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার গণআন্দোলনকে

শক্তিশালী করবার তাদের ঘোষিত নীতি বলিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে তাহলে শোষণ থেকে মুক্তি এনে দিতে না পারলেও শোষণমুক্তির আন্দোলন পরিচালনার স্বার্থে এর তাৎপর্য আছে। সে কথা আমি পরে আলোচনা করছি।

এখন দেখা যাক, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর আজও দেশের মূল অবস্থা কী? আজও শ্রমিকদের চাকরির স্থায়িত্ব নেই, শ্রমিকরা যে সম্পদ তৈরি করে, উৎপাদনের পেছনে যে পরিশ্রম তারা করে তার ন্যায়সঙ্গত মূল্য তারা পায় না। তাদের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদের ওপর একদল পরগাছা জীব আমিরি করে বেড়াচ্ছে। তারাই ক্ষমতাবান, তারাই প্রভাবশালী, তারাই সম্মানিত ব্যক্তি। এমনকী তাদের একজনের প্রতিবাদও কাগজে ফলাও করে ছাপানো হয়। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ যারা দেশের সম্পদ গড়ে তুলছে তাদের হাজার লোকের বুকফাটা কান্নার কথাও কাগজে বেরোয় না। কিন্তু শ্রমিকদের তৈরি সম্পদের ওপর পরগাছার মতো আমিরি করে অনেকটা অসভ্য জানোয়ারের জীবনযাপন করে যারা, তারা একটা কথা বললে সে সম্বন্ধে সারা দেশ জুড়ে একটা আলোড়ন পড়ে যায়। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের অন্তরের কথা কী, সত্যিকারের প্রয়োজন কী, যথার্থ চাহিদা কী, তারা কী বলছে — তাকে রূপ দেওয়ার জন্য দেশে কাগজ নেই। পুঁজিপতিশ্রেণী বা তাদের তাঁবেদার সম্প্রদায় মজুরের বুকের এই ব্যথা এবং তাদের সত্যিকারের প্রয়োজন সম্পর্কে যে কোন গুরুত্ব দিতে চাইবে না — এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দেশের যারা বুদ্ধিজীবী, মধ্যবর্তী বিরাট জনসাধারণ, তাদের চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়েও মজুরের চাহিদার প্রতি কোন দায়িত্ববোধ, কোনও গুরুত্ব, শ্রমের প্রতি যথার্থ সম্মানবোধ আজও সৃষ্টি হয়নি। অনেক কিছু পড়াশুনা করে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় শুধু মিথ্যা 'ইগো'র (অহম্-এর) বোঝাই ভারি করে তুলছেন। মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের প্রতি তাঁদের এই মনোভাব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টির পেছনে যে দস্যুতা ও জুলুমের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে তার হদিশ তাঁরা আজও পাননি। আজও দেশের মানসিকতা এভাবে সৃষ্টি হয়নি যে, এই যে মানুষগুলো, লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের পরিশ্রমের ফলে সম্পদ গড়ে উঠেছে, সভ্যতা গড়ে উঠেছে, আর যে সম্পদের ওপর আমরা গর্ব করি, যে সভ্যতার ওপর আমরা গর্ব করে থাকি তা মজুররাই সৃষ্টি করে — মালিকরা নয়। যে উৎপাদন বাড়লে জাতির উন্নতি হবে বলছি সেই উৎপাদনও বাস্তবে মজুররাই সৃষ্টি করে, মালিকরা নয়। আজও করছে, কালও যদি উৎপাদন বাড়ে, তারাই করবে। মালিকের টাকার জন্য উৎপাদন হয় না, বরঞ্চ মজুরের পরিশ্রমের ফলে যে উৎপাদন হয় সেই উৎপাদন থেকে অর্জিত সম্পদ মজুরদের ফাঁকি দিয়ে মালিকের ঘরে টাকা জমছে। সেই

মজুরের মর্মবেদনা কী, সেই মজুরের জীবনের সামনে মূল সমস্যা কী, গোটা সমাজের অগ্রগতি প্রগতির স্বার্থেই তাকে বোঝবার দরকার আছে। কিন্তু তাকে প্রতিফলিত করার কোন যন্ত্র, দেশজোড়া এমন কোন শক্তিশালী অস্ত্র অর্থাৎ সংগঠন আজও দেশে গড়ে ওঠেনি। আর তা নেই বলেই মালিকরা তুচ্ছ কথা নিয়ে যখন তখন হট্টগোল বাধায়। পাঁচটা মালিক যে মনোভাব প্রকাশ করছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শ্রমিক জনসাধারণের সঙ্গে সে মনোভাবের কোন সংযোগ নেই — তারা একটা সম্পূর্ণ পাল্টা মনোভাবকে প্রতিফলিত করছে। অথচ সেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শ্রমিকের মনোভাবের প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে, ঐ পাঁচটা মালিকের যে চিৎকার তাকেই কাগজগুলোর মারফত সোচ্চারে প্রচার করা হচ্ছে, তার ওপরে হট্টগোল করা হচ্ছে, তার ওপরে যত যুক্তি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হচ্ছে।

এই যে জিনিসটা সমাজে চলছে আপনারা দেখছেন, তার কারণ গোটা সমাজের মানসিকতা এইভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু কেন? কারণ আমাদের বর্তমান যে সমাজ, এ সমাজ পুঁজিপতিদের তাঁবেদার সমাজ, তাদের পৃষ্ঠপোষক সমাজ। এর সমস্ত কিছু তাদের সেবা করতে বাধ্য, না করলে কারোর চলবার উপায় নেই। হয় এই ব্যবস্থার সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে, সাহসের সাথে লড়তে হবে, নয় যেভাবেই হোক্ এর দাসত্ব করে চলতে হবে। ধরুন, যারা সংবাদপত্র চালায় তাদের সমস্যা হচ্ছে যে, মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা না করলে কাগজ চলবে না। কারণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে তাকে ফলাও করে মালিকের কথা বলতে হবে। আর যারা সংবাদপত্রে কাজ করে, চাকরির স্বার্থে প্রতিদিন তাদের মালিকের স্বার্থের পায়ে নিজেদের বিকিয়ে দিতে হচ্ছে। এমনকী ইলেকশনের মধ্য দিয়ে সরকারের গদিতে যাঁরা বসেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে এইভাবে ভেবে থাকেন যে, যদি মালিকের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা না করেন তাহলে সরকারি গদিতে তাঁদের থাকবার উপায় নেই, তাঁরা বেশিদিন থাকতে পারবেন না। ফলে দেখা যায়, এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসি সরকার তার আচরণ, তার কর্ম, তার ব্যবহার, তার চিন্তা, সমস্ত কিছুর দ্বারা এই পুঁজিবাদী সমাজটাকেই সেবা করে এসেছে। আর এই পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবার নাম দেশসেবা দিয়েছে, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে রচিত পরিকল্পনাগুলোকে দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা বলেছে, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের পায়ে মজুরের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার নাম দিয়েছে দেশের স্বার্থে মজুরের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া, ব্যক্তির স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া। আমি মনে করি, এই মিথ্যাচারটি সর্বপ্রথমে দূর হওয়া দরকার।

এখন দেশের এই যে বর্তমান অবস্থা তার মধ্যে আপনাদের আন্দোলনের,

লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য কী হবে? আপনারা কার বিরুদ্ধে লড়বেন, কেন লড়বেন এবং কীভাবে লড়বেন? সে লড়াইয়ের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কী হবে? আপনাদের স্পষ্ট করে বুঝতে হবে, কী আপনারা চান যাতে শেষ পর্যন্ত আপনাদের মৌলিক অবস্থার, মূল সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে? সেটা কি শুধু দৈনন্দিন দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করা? আমি বলি, এ তো আছেই, কিন্তু এটাই লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। গত ৪০ বছর যাবৎ ভারতবর্ষের শ্রমিক মাইনে বাড়াবার জন্য, আইনকানুন পাল্টাবার জন্য, অধিকার বাড়াবার জন্য লড়াই করে আসছে। অধিকার আপনারা কিছু কিছু অর্জনও করেছেন। এর কোনও তাৎপর্য নেই, একথা আমি বলছি না। এর যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। কিন্তু সে তাৎপর্য শুধু একটাই। তা হচ্ছে এই অধিকারগুলো ব্যবহার করে দৈনন্দিন গণআন্দোলনগুলো শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে এমন অমোঘ বিপ্লবী সংগঠনশক্তি গড়ে তোলা যাতে একদিন এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করে শোষণহীন শ্রমিকশ্রেণীর রাজ কায়েম করা সম্ভব হয়। কিন্তু সে যদি না হয়, শুধু দু'চার-পাঁচ টাকা মাইনে বাড়ানোই যদি আপনাদের আন্দোলনের বা লড়াইয়ের মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে শ্রমিক আন্দোলনে এক ধরনের সুবিধাবাদের জন্ম হতে বাধ্য, এবং আপনারা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী মনোভাবকে এই সুবিধাবাদ ইতিমধ্যেই অনেকাংশে গ্রাস করে ফেলেছে।

শ্রমিক আন্দোলনে এই সুবিধাবাদের অনুপ্রবেশই আপনাদের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব গড়ে তুলছে যে, যে সমস্ত নেতাদের ধরলে তাঁরা মালিকদের কাছ থেকে এ ধরনের সুবিধা আপনাদের আদায় করে দিতে পারবেন, আপনারা তাঁদের পেছনেই চলবেন। আর এইভাবে যদি চলতে থাকেন তাহলে আপনাদের এই দুর্ভাগ্য কেউ পাল্টাতে পারবে না, স্বয়ং ঈশ্বরও পাল্টাতে পারবে না। ঈশ্বরেরও ক্ষমতা নেই যে আপনাদের দুর্ভাগ্য পাল্টাতে পারে। তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক সংঘশক্তি কোনদিনই গড়ে উঠবে না এবং পুঁজিবাদী শোষণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি কোনদিনই অর্জিত হবে না।

ফলে এ রাস্তা ছাড়তে হবে। আপনাদের দুর্ভাগ্য একমাত্র পাল্টে যেতে পারে যদি আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের প্রকৃত মুক্তির প্রশ্নটা ভারতবর্ষের গোটা সমাজব্যবস্থাকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের আঘাতে পরিবর্তিত করার মধ্যেই নিহিত। আর এ পরিবর্তনটা শুধু মাঠে ঘাটে 'এটা চাই' 'ওটা চাই' করে চিৎকার করলেই হয় না। সুনির্দিষ্ট ও সচেতন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও সম্প্রসারণ এবং দাবিদাওয়া আদায় করার জন্য লড়াই করার অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই খানিকটা

সুযোগসুবিধা অর্জন। পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদের কোন বাস্তব ও সর্বাত্মক পরিকল্পনা না নিয়ে শুধুমাত্র আইনকানুন পাল্টানো ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের লড়াই পরিচালনা করার অর্থ দাঁড়ায় যে, শোষণটা যেমন চলছে তেমনি চলুক, যেমন গোলাম হয়ে আপনারা রয়েছেন তেমন গোলাম হয়েই থাকতে আপনারা রাজি, তাতে আপনাদের আপত্তি নেই, তাতে আপনাদের আত্মসম্মানে লাগবে না, আপনারা পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি অর্জন করতে চান না — শুধু শোষণের জ্বালাটা একটু কমানো, একটু মোলায়েম করাই আপনাদের আন্দোলনগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এর ফলে মালিক মালিকই থাকছে, আপনি মজুর মজুরই থাকছেন, আপনাকে শোষণ করার তার পুরো অধিকার থাকছে, এবং সামাজিক উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকছে, উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনই থাকছে। এই অবস্থা যদি থাকে তাহলে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে কোনদিন শ্রমিকের মুক্তি অর্জিত হতে পারে না।

এখানে আর একটা কথাও আপনাদের ভাল করে বুঝতে হবে। আপনারা উৎপাদন করেন সমাজের জন্য। অথচ আপনাদের বোঝানো হয় যে, আপনারা যে কাজ করেন তা নিজেদের পেটের জন্য এবং আপনাদের এই যে ভরণপোষণের উপায় ও দেশের উন্নতির জন্যই নাকি মালিকরা কলকারখানা এবং উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এটা একটা নির্জলা মিথ্যা কথা। আপনাদের আজ এটা বুঝতেই হবে, আপনার পরিশ্রম আজ মূলত আপনার ভোগের জন্য নয়, যদিও প্রত্যেক মানুষের পরিশ্রমের পিছনে একটা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিক আছে। আজকে আপনাদের পরিশ্রমের চরিত্রটা হয়ে পড়েছে সামাজিক। আপনি কাজ করেন সমাজের জন্য। আপনার পরিশ্রম থেকে যে উৎপাদন হয় তার চরিত্র সামাজিক। তা সমাজের ভোগে লাগে তাই সভ্যতার ক্রমবিকাশ হচ্ছে, দেশের উন্নতি হচ্ছে। ফলে আপনার সমস্ত পরিশ্রমই দেশের উন্নতির জন্য। ফলে আপনি যে পরিশ্রম করছেন এবং সেই পরিশ্রম করার বদলে আপনার বেঁচে থাকবার জন্য মজুরি হিসাবে আপনি যা পাচ্ছেন সেটা সমাজেরই দেওয়ার কথা। কিন্তু সমাজের বদলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকার দরুন সেটা দিচ্ছে মালিকশ্রেণী। ফলে ব্যক্তি মালিক আপনাকে ততটুকু দিচ্ছে যতটুকু না হলে আপনি বেঁচে থেকে তার শোষণের, তার মুনাফার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারেন না। ন্যূনতম যতটুকু হলে আপনি খেয়ে পরে বেঁচে থেকে আপনার দৈহিক পেশীকে ঠিক রেখে মজুর হিসাবে অর্থাৎ মালিকের মুনাফা অর্জনের শিকার বা যন্ত্র হিসাবে পরিণত হতে পারেন, ঠিক ততটুকু মজুরি তারা আপনাকে দিচ্ছে, আর আপনার পরিশ্রম থেকে উদ্ভূত বাকি সমস্ত সম্পদ ব্যক্তিগত মুনাফা হিসাবে মালিকরা আত্মসাৎ করছে। ফলে এ ব্যবস্থায় কোন

সচেতন মজুরই সামাজিক ন্যায়বিচার আশা করতে পারে না। এখানে মালিকের কাছে শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজনের ধারণাটা কী? একটা মজুরের বেঁচে থাকার প্রশ্নে যখন ন্যায়বিচারের কথা ওঠে স্বভাবতঃই তখন বলা হয় যে, মজুরকে এমন কিছু দাও ন্যূনতমপক্ষে যা ন্যায়সঙ্গত এবং মানবিক। কিন্তু এই মালিকি ব্যবস্থায় মালিকের কাছে এই ন্যায় ও মানবিকতার ধারণা কী? এখানে মালিকের কাছে মানবিকতার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, যেটুকু না হলে মজুরের পক্ষে বেঁচে থেকে দৈহিক পেশী সঞ্চালন করাই মুশকিল, মালিকের কারখানায় মেশিন চালানোই মুশকিল, তার মুনাফা অর্জন করে দেওয়াই মুশকিল, ততটুকু দেওয়াই তাদের কাছে মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত।

এখন বর্তমান অবস্থায় মালিকরা শ্রমিকের মজুরির ন্যায্য মূল্য দেওয়া তো দূরের কথা যখন এই ন্যূনতম প্রয়োজন থেকেও বঞ্চিত করছে, তখন বেঁচে থাকতে হলে মজুরদের সামনে ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলির ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই। আর যে ঘেরাও নিয়ে বর্তমানে এত হৈচৈ করা হচ্ছে সেই ঘেরাও হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন 'ফর্মে'র (রূপের) মধ্যে একটি রূপ মাত্র, যা বাস্তব অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এদেশের গণআন্দোলনের একটি ধারা হিসাবে গড়ে উঠেছে। টাটা বলেছে, ঘেরাও হচ্ছে জঙ্গলের আইন। আমি বলি, তাহলে যে আইনে তোমরা মালিকরা উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা করছো তা হচ্ছে গভীর জঙ্গলের আইন। শ্রমিকরা যে ঘেরাও করে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা — অপরকে শোষণ করা নয়। আর মালিকদের অধিকারগুলো হচ্ছে, মানুষ এবং মানবতার আদর্শকে পায়ে মাড়িয়ে নিংড়ে তার রসকে ব্যক্তিগত সুবিধার কাজে ব্যবহার করা। অথচ একেই তারা বলছে সভ্যতা, আর ঘেরাওকে বলছে জঙ্গলের আইন। ঘেরাও যদি জঙ্গলের আইন হয়, তাহলে মজুর ছাঁটাই করার মালিকদের অবাধ অধিকার, অর্থাৎ যে আইনে মালিকদের 'আন্‌ফেটারড রাইট অব রিট্রেঞ্চমেন্ট উইদাউট গিভিং প্রোটেকশন ফর রাইট টু ওয়ার্ক' (মজুরকে চাকরির কোনরূপ কার্যকরী নিশ্চয়তা না দিয়ে মালিকের ছাঁটাই-বরখাস্তের একতরফা নিরঙ্কুশ অধিকার) দেওয়া হয়েছে তা গভীর জঙ্গলের আইন। তা 'আন্‌সিভিলাইজ্‌ড্‌, প্রিমিটিভ ইন নেচার, টরচারাস্‌ ইন নেচার' (অসভ্য, প্রকৃতিতে আদিম এবং অত্যাচারী)। মজুরদের ঘেরাও আন্দোলনের নিন্দা করার পূর্বে তাকে পরিবর্তন করতে হবে। শ্রমিক শখে ঘেরাও করে না। তারা দিনরাত পরিশ্রম করে, আর পরিশ্রম করে গোটা দেশের ও সমাজের জন্য। অথচ সেই শ্রমিকের ন্যূনতম স্বার্থকেও রক্ষা করার দিকে ঘেরাও-বিরোধী আন্দোলনের উমেদারদের নজর নেই। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার ব্যবস্থা হলে ঘেরাও করার

তাদের দরকার হবে না। যতক্ষণ তাদের স্বার্থকে রক্ষা না করা হচ্ছে তারা তাদের অধিকার আদায় করবেই। আইন যদি সাহায্য করার বদলে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে প্রয়োজন মতো আইনের বিরুদ্ধে গিয়েও 'কজ অব হিউম্যান জাস্টিস'কে (মানবিক ন্যায়বিচারের আদর্শকে) তারা উচ্চে তুলে ধরবে, দরকার হলে আইনকে পরিবর্তিত করতে বাধ্য করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই শ্রমিক আন্দোলনগুলোকে বিচার করতে হবে। সরকারের গদিতে বসে সরকারি কর্তারা কী করবেন তা তাদের বিচার্য বিষয়। কিন্তু সত্যিকারের দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক জনসাধারণের মনের ভাবটা হওয়া উচিত এইরকম এবং এইটা বুঝেই তাদের বর্তমান আন্দোলনগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে হবে।

আর শ্রমিকদের বোঝা দরকার যে, শুধু সরকারি যন্ত্রের সুযোগ নেওয়াই তাদের কাজ নয়। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা যে লড়াই করবে সে লড়াই বেশি দিন টেকে না। সরকার গুঁতো দিলে আর লড়াই থাকবে না। আজ সরকার গুঁতো দিচ্ছে না, লড়াই দানা বাঁধছে। কাল সরকার গুঁতো দিতে শুরু করলে লড়াই ভেঙে যাবে। তাই রাজনৈতিক চেতনা অর্জন ও লৌহদৃঢ় সংঘশক্তি সমস্ত লড়াইয়ের একটা অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। মজুরের দুর্দশার ইতিহাস, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মূল সমস্যা — এগুলো নিয়ে মজুরদের মাথা ঘামাতে হবে। বুঝতে হবে যে, গোটা ভারতবর্ষে সরকার পাল্টানো, আইন-কানুন পাল্টানো, আর ঘেরাওতে পুলিশ যাবে কি যাবে না — শুধু এতে শ্রমিকের মুখ্য লাভ কিছু নেই। শ্রমিকের মূল মুক্তির লড়াই সংগঠিত করার কাজে যদি তাঁরা একে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন তবেই একমাত্র সাময়িকভাবে হলেও এর একটা বিরাট মূল্য আছে। আর এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই বামপন্থী সরকার গঠিত হলে যাতে গণআন্দোলনগুলিকে পুলিশি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা যায় তার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই নির্বাচনের বহু আগে থেকেই লড়াই করে আসছিল।

আর একটা কথা দেশের মানুষকে ভেবে দেখতে হবে। 'আইনের চোখে সবাই সমান' — এটা কাগজে-কলমে লেখা আছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে আইনকে ব্যবহার করা হয় মজুর পেটাবার অস্ত্র হিসাবে, মালিকের স্বার্থে। কাজেই বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে 'আইন সবার জন্য সমান' — এই কথাটিকে আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ছাত্ররা, বিপ্লবীরা বলি, এটা একটা অত্যন্ত মিষ্টি কথা — মানে মিষ্টি অথচ নির্জলা মিথ্যা কথা। এখানে 'ল প্রিটেন্ডস্ টু বি ইক্যুয়াল বাট ইন অ্যাকচুয়ালিটি ইট ইজ নট ইক্যুয়াল ফর অল পিপল। ইট সেফগার্ডস দি ইন্টারেস্ট অব দ্য ক্যাপিটালিস্টস'। (আইন সবার জন্য সমান —

এইটা এ সমাজে দেখানো হয়, কিন্তু বাস্তবে আইন সবার জন্য সমান নয়। এ সমাজে আইন পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে)। অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আইন শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে বাধ্য। কাজেই 'আইনের চোখে সবাই সমান' — এটা আইনের শ্রেণীচরিত্র চেপে রেখে সাধারণ মানুষকে ভাঁওতা দেওয়ার একটা বুর্জোয়া চালাকি মাত্র। এ কথা যাঁরা বুঝতে চান না তাঁরাই পুঁজিবাদী সমাজে 'জুডিসিয়ারি'র শ্রেণীচরিত্র আড়াল করে জনমতকে বিভ্রান্ত করার হীন উদ্দেশ্যে প্রচার করে চলেছেন যে, জুডিসিয়ারি নাকি 'কাস্টডিয়ান অব জাস্টিস অ্যান্ড পাবলিক কনসেন্স', অর্থাৎ ন্যায়বিচার এবং জনসাধারণের বিবেকের অভিভাবক। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে 'পাবলিক কনসেন্স' বা জনগণের বিবেকও শ্রেণীর ঊর্ধ্বে বা শ্রেণী-নিরপেক্ষ বিবেক হতে পারে না, তা কোন না কোন শ্রেণীচিন্তারই প্রতিফলন মাত্র।

ঠিক একইরকমভাবে বলা হয়ে থাকে, পুলিশও নাকি 'নিউট্রাল'। কিন্তু একজন পয়সাওয়ালা লোক থানায় গেলে দেখবেন তার কত খাতির, কত 'ওয়েট'। তার একটা ফালতু চার্জ-এর ওপর কত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আর আপনি সাধারণ মানুষ, আপনার জীবন জেরবার হয়ে যাচ্ছে, আপনার উমেদার নেই, পয়সার জোর নেই, আপনার কথায় কর্ণপাতই কেউ করবে না। সমস্ত ব্যবস্থাটাই এইরকম। প্রতিটি সাধারণ মানুষ প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা উপলব্ধি করছে। কোন মালিক যদি একটা মিথ্যা ডায়েরি করতেও আসে তাহলে থানা অফিসাররা সে সম্বন্ধে অত্যুৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন। আর মালিকের অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে মজুর একটা ডায়েরি করতে গেলে, উল্‌টে থানার বড়কর্তারা মালিকদের বিরুদ্ধে ডায়েরি করতে এসেছে বলে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে সেই মজুরকেই লক্‌আপ-এ পুরে দেয় — এমন নজির এদেশে হামেশাই ঘটছে।

আমি এখানে দেশের সাংবাদিকদের একটা কথা বলতে চাই। তাঁরা দেশের 'বড়' 'বড়' সমস্যা নিয়ে লেখেন, অথচ এইসব জিনিসের দিকে একেবারেই নজর দেন না। তাঁরা 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন', 'গণতন্ত্র' 'গণতন্ত্র' বলে হামেশাই চিৎকার করে থাকেন। কিন্তু গণতন্ত্রের আসল প্রাণশক্তি কী? সেকি শুধু খবরের কাগজের লেখা আর পার্লামেন্টের মেম্বারদের বক্তৃতা ছাপানো? না। গণতন্ত্রের আসল শক্তি জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনা এবং গণতান্ত্রিক সংঘবদ্ধতা। সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে যদি রক্ষা করা না যায়, গণতান্ত্রিক সংঘশক্তিকে যদি দানা বাঁধতে না দেওয়া যায়, গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ যদি খুলে দেওয়া না যায় তাহলে গণতন্ত্র এমনি মরবে, তাঁরা চিৎকার করলেও মরবে।

তাহলে অন্তত বুর্জোয়া অর্থেও এদেশের গণতন্ত্রকে তাঁরা টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। তাই যাঁরা গণতন্ত্রের নামে আইনের শাসনের এত পক্ষপাতী তাঁদের বুঝতে হবে, এই আইনের শাসনও যদি তাঁরা টিকিয়ে রাখতে চান তাহলে শুধু কাগজে লিখে হবে না, সৎসাহসের সঙ্গে সমস্ত ন্যায্য আন্দোলনগুলিকে পৃষ্ঠাপোষকতা করতে হবে। এঁরা কিছুতেই বুঝতে চান না যে, যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা না যায় তাহলে এই 'আইন ও শৃঙ্খলা'র দোহাই দিয়েই যে কোন দিন মিলিটারি এসে নির্বাচিত আইনসভাগুলিকে ভেঙে দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারে — বিশেষ করে জনসংঘ[১], স্বতন্ত্রের[২] মত দলগুলির সমর্থন মিললে তো কথাই নেই। তখন কাগজওয়ালারা পার্লামেন্টারি শাসন রক্ষা করতে পারবেন না। এইরকম দুরবস্থার হাত থেকে দেশকে সেদিন রক্ষা করতে পারে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সংঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক চেতনাই একমাত্র সে অবস্থায় দেশকে রক্ষা করতে পারে। আর এটাই 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গভর্নমেন্টের গণআন্দোলন সংক্রান্ত নীতির ঘোষিত উদ্দেশ্য। যুক্তফ্রন্ট সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ বন্ধ করার যে নীতি ঘোষণা করেছে তার অর্থ দেশের মানুষ এই সংঘবদ্ধ-চেতনাবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলার, গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার একটা সুযোগ পাক, যে সুযোগ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে দ্রুত গণআন্দোলনগুলো এবং গণসংগঠনগুলো গড়ে তোলা আজ অনেক সহজসাধ্য হবে। পুলিশের দাপটে, মালিকদের স্বার্থের দাস হয়ে গিয়ে পুলিশ যেভাবে এতদিন আচরণ করেছে তার জন্য পূর্বে তা করা সম্ভব হয়নি — করবার স্পেস পায়নি, একটা 'ব্রিদিং স্পেস' পায়নি, নিঃশ্বাস নেবারও অবকাশ ছিল না। শ্রমিকরা একটা ইউনিয়ন করতে গেল অমনি ডায়েরি হয়ে গেল। যারা ইউনিয়ন করতে গেল সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছাঁটাই করে বসিয়ে দিল, গোপনে রিপোর্ট নিয়ে তাদের ছাঁটাই করে দিল। তাদের রক্ষা করার কোনও উপায় ছিল না। তাদের রক্ষা করার জন্য দেশে কোন আইন নেই, কোন ব্যবস্থা নেই। পুলিশের কাছে বলা মানে আরেক বিপদ ডেকে আনা। পুলিশের কাছে গিয়ে অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে 'মালিকের বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছিস' — বলে উল্টে তাকেই যেকোন একটা চার্জ দিয়ে আটকে রেখে দিত। এই ছিল বাস্তব অবস্থা। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় একটা প্রগতিশীল গভর্নমেন্ট, বামপন্থীদের কথা থাক্,

---

১। হিন্দু মৌলবাদী পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) যার থেকে জন্ম নিয়েছে।

২। একটি রক্ষণশীল পার্টি, বর্তমানে যার অস্তিত্ব নেই।

এতটুকু প্রগতিশীল, এতটুকু মানবিক যদি একটা গভর্নমেন্ট হয়, যার চোখ অন্ধ নয়, এবং অন্তত মালিকের দালালি করতে চায় না সে এই অবস্থায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে কী করতে পারে? তার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ হওয়া উচিত সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, যদি তা ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক হয়, তবে তাকে পুলিশের এই 'আইন ও শৃঙ্খলা'র অজুহাত থেকে, পুলিশের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা।

কিন্তু শ্রমিক সমাজকেও তাদের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পুলিশের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করার এই যে তাৎপর্য — এটাকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। পুলিশি হস্তক্ষেপ থেকে আন্দোলনগুলোকে রক্ষা করার তাৎপর্য কী? এই রক্ষা করার তাৎপর্য হচ্ছে — বৃহত্তর গণআন্দোলন, পুঁজিবাদবিরোধী গণআন্দোলনের চেতনায় শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করার যে অবকাশ আপনারা পেলেন তাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই অধিকারকে অপব্যবহার করা নয়। তাহলে এর সমস্ত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, বানচাল হয়ে যাবে। যদি হয় কথায় নয় কথায় আপনারা ঘেরাও করেন তাহলে এর যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সেটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাজেই আমি মনে করি, এ অবস্থায় শ্রমিক সমাজকে দু'রকমের আন্দোলন করতে হবে। একটা হচ্ছে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সচেতন সংঘবদ্ধ শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে বর্তমান অবস্থায় নিজেদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলি পরিচালনার সময়ে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিতে হবে। তাদের এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে, সরকারের ঘোষিত এই নীতি পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, মালিকশ্রেণী, সরকারি আমলাতন্ত্রের এক শক্তিশালী অংশ, এমনকী যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরেও কিছু শক্তির একটা সম্মিলিত চাপ কাজ করছে। এটা যুক্তফ্রন্ট সরকার। সত্য কথাটা আপনাদের সামনে আসা দরকার। এ সরকার একদলীয় সরকার নয়, বা শুধুমাত্র বামপন্থীদের নিয়ে গঠিত একটি বামপন্থী সরকারও নয়। এছাড়া এই সরকার একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে, একটা সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করছে। ফলে এর অনেক অসুবিধা। অনেক কিছু আপনারা আশা করতে পারেন। কিন্তু আশাই শুধু করবেন — এ অসুবিধাগুলোর কথা মনে রাখবেন না, সে সম্বন্ধে কোনও সচেতনতা আপনাদের থাকবে না, কোনও হিসাব আপনাদের থাকবে না তাহলে নিজেদেরই অনিষ্ট করে বসবেন। কীভাবে অনিষ্ট করবেন? না, একদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও তার প্রগতিশীল নীতিগুলি বানচাল করার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের যে চক্রান্ত চলছে সে সম্বন্ধে আপনাদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা ও অন্যদিকে সরকারের প্রগতিশীল নীতির তাৎপর্য

না বুঝে, মুখ্য উদ্দেশ্য কী সেইটার দিকে স্থির দৃষ্টি না রেখে 'পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না' — এইটার সুযোগে এমন সব উগ্র আচরণ করতে থাকবেন, ছোটখাট তুচ্ছাতিতুচ্ছ রাগ, ব্যক্তিগত আক্রোশ — যে সমস্ত এতদিন আপনাদের মনের মধ্যে জমে আছে সেইগুলোকে প্রকাশ করতে থাকবেন এবং যে সমস্ত পার্টি এর রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই হোক্ অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যেই হোক্ সাময়িক সংগঠন বৃদ্ধির হীন সংকীর্ণ পার্টি স্বার্থে এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে তাদের হীন স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হবেন। এর ফলে মালিকশ্রেণী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে সরকারকে 'ডিসক্রেডিট' (হেয়) করার, সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে সমাবেশ করার সুযোগ আপনারা তুলে দেবেন। আর এইভাবে অন্ধের মতো মালিকদের হাতে একটার পর একটা বিরুদ্ধ আক্রমণের সুযোগ তুলে দিতে থাকলে অবস্থা এমন দাঁড়াতে পারে, যার মোকাবিলা করা এই সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এই সরকার এমন নয় যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

গোড়ায় এই প্রশ্নটি ধরেও আমি আলোচনা করতে পারিনি, অন্যদিকে এসে গিয়েছি জরুরি মনে করে। আপনাদের মনে রাখা দরকার, এই সরকার প্রবল ক্ষমতাবান সর্বক্ষমতাসম্পন্ন একটা 'বডি' নয়। নির্বাচন হলেই আর তার মারফত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই সেই সরকার ইচ্ছামত আইন পাল্টাতে পারবে, সবকিছু করে দিতে পারবে — এটি একটি মিথ্যাচার। এই যেমন, বর্তমান সরকার একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে কী বাধা, তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কী সোরগোল সুরু করেছে! আপনাদের আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাইছি, বাধা সৃষ্টি ও সোরগোলের এখানেই শেষ নয়। এ সবেমাত্র শুরু, এ ঝড়ের পূর্বাভাস। রাজনীতিতে অভিজ্ঞ লোকমাত্রেই জানেন যে, এ কিছু নয়, এ শুধু দাবার বোড়ের চাল হচ্ছে। ঘোড়ার চাল, গজের চাল এখনও শুরু হয়নি। এসব খেলা শুরু হবে। তখন এ সরকার টিকে থাকবে কি থাকবে না তা নির্ভর করবে একমাত্র গণআন্দোলন, গণচেতনা, জনগণের বিপ্লবী সংঘবদ্ধতার উপর। আপনারা শ্রমিকরা যদি রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন আর ভাবেন যে, সরকার যখন সর্বক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওখানে বসে আছে তখন আপনারা শুধু নিজেদের ইচ্ছেমত আচরণ করে যাবেন আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, মালিকদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলবেন, কিন্তু রাজনীতির যে চক্রান্ত চলছে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র নিজেরা ওয়াকিবহাল থাকবেন না এবং অপরকে সচেতন করবেন না, তাহলে দেখবেন চোখের সামনে যেকোন দিন মন্ত্রীত্ব পড়ে গেছে, রুখতে পারবেন না। কারণ এ সরকার কিছু নয়। আসল শক্তি হচ্ছে রাষ্ট্র, আসল শক্তি অর্থনৈতিক

ক্ষমতা যাদের হাতে, যারা ব্যাঙ্কিং পরিচালনা করে, শিল্প কারখানা পরিচালনা করে, আর রাষ্ট্রের যারা স্থায়ী 'স্টাফ' অর্থাৎ রাষ্ট্র-কাঠামো।

রাষ্ট্র আর সরকার — বাংলাতেও দু'টো কথা, ইংরেজিতেও দু'টো কথা। সব ভাষাতেই দু'টো কথা — ভাষার সীমাবদ্ধতা না থাকলে। এই দু'টো কথা এই জন্য যে, জিনিস দু'টো আলাদা। রাষ্ট্র বলতে একটা ব্যবস্থা, একটা 'সিস্টেম'কে বোঝায়, আইন-শৃঙ্খলার একটা ধারণা, নীতির একটা ধারণাকে বোঝায়, কতকগুলো মৌলিক অধিকারের একটা ধারণাকে বোঝায় আর তার ভিত্তিতে তাকে রক্ষা করার জন্য আমলাতন্ত্র, প্রশাসনিক বিভাগ, জুডিসিয়ারি এবং সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী — এই সমাবেশ বোঝায়। আর সরকার হচ্ছে আমার ভাষায় তাদের দারোয়ান, একে দেখভাল্ করে। যেমন একটা তাঁতের যন্ত্র। সেটা একটা যন্ত্র, এক নিয়মে কাজ করে। তার ওলটপালট নেই। তার বাঁধুনিটাই এমন যে, একটা বিশেষ নিয়মে এইভাবে সুতো যাবে, এইভাবে কাপড় বেরিয়ে আসবে। একটু ওলটপালট হয়ে গেলেই যন্ত্র বিকল হয়ে যাবে, আবার তাকে মেরামত করতে হবে। কিন্তু তাঁতযন্ত্র যদি ঠিক থাকে তাহলে ঠিক একই নিয়মে সুতো যাবে, একই নিয়মে কাপড় বেরিয়ে আসবে এবং ভাঁজ হবে। তেমনি রাষ্ট্রযন্ত্র হচ্ছে অনেকটা এই তাঁতযন্ত্রের মত। রাষ্ট্রব্যবস্থাটা অনেকটা এইরকম যন্ত্র, আর সরকার হচ্ছে তাঁতি। তা তাঁতি যাকেই করা হোক্ যতক্ষণ তাঁতযন্ত্র থাকবে ততক্ষণ কাপড়ই বুনতে হবে। তাঁতি পরিবর্তনে কী পার্থক্য হয়? না, কাপড় বোনার ব্যাপারে একটা খারাপ তাঁতি, ফাঁকিবাজ তাঁতি হলে ফাঁকি দেয়, বেশি সময় নেয়, অল্প কাপড় বোনে। ভাল তাঁতি হলে অল্প সময়ে বেশি কাপড় বোনে, সুন্দর কাপড় বোনে। আর আছে ব্যক্তিগত ব্যবহার। আমি বলছি যে, সরকার পরিবর্তন হচ্ছে এই তাঁতি পরিবর্তনের মতো। আর রাষ্ট্রের পরিবর্তন, সমাজব্যবস্থা পাল্টানো মানে তাঁত যন্ত্রটাই পাল্টে আর একটা যন্ত্র বসানো। এখন তাঁতটাকে মনে করুন রাষ্ট্রযন্ত্র যে যন্ত্র দিয়ে শোষণ বেরোচ্ছে, আর কাপড়টাকে মনে করে নিন শোষণ। অর্থাৎ আপনাদের ওপর যে অত্যাচার যে জুলুম হচ্ছে — এই জুলুম-অত্যাচারগুলো এই শোষণের যন্ত্রটার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে। পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রটা হচ্ছে এই তাঁতের যন্ত্রটার মতো একটা যন্ত্র যার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত শোষণ বেরোচ্ছে। এই সমাজব্যবস্থা এমন একটা সমাজব্যবস্থা যে বেকারের সৃষ্টি করে, যে ফাটকাবাজির জন্ম দেয়, যে 'অ্যানার্কি' এবং 'ক্রাইসিস ইন প্রোডাকশন' অর্থাৎ উৎপাদনে অরাজকতা এবং সঙ্কট এনে ফেলে, বাজার সঙ্কট নিজে সৃষ্টি করে, বাজার মন্দা নিজে সৃষ্টি করে, উৎপাদনের সঙ্কট সৃষ্টি করে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির নামে সঙ্কট সৃষ্টি করে, শুধু মালিকদের মুনাফা বাড়ায়।

এবং এইরকম সমাজব্যবস্থাকে দেখবার জন্য উপযুক্ত সংবিধান, আইনকানুন, মিলিটারি, সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ-ব্যুরোক্রেসি, শাসনযন্ত্র এবং বিচার বিভাগ নিয়ে যে কাঠামোটি তা হচ্ছে রাষ্ট্র এবং তাকে আমি বলছি তাঁত। সেইটা একটা তাঁতের মতো, আর সরকার হচ্ছে তাঁতি। তা আমার বক্তব্য তাঁতির ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ! তাঁতি কি ইচ্ছে করলেই তাঁতযন্ত্র দিয়ে আখ মাড়াতে পারে? ঠিক তেমনি যে কোনও সরকার কি ইচ্ছে করলে এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্য দিয়ে সমাজবাদ প্রবর্তন করতে পারে, না জনগণের মুক্তি এনে দিতে পারে, না জনগণের স্বাধীনতা এনে দিতে পারে? পারে না। পারে না বলেই শ্রমজীবী জনসাধারণকে সফল বিপ্লবের আঘাতে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা পাল্টে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। এবং একদিকে নেতৃত্বের এই রাজনৈতিক সংগঠন, অপরদিকে বিপ্লবী গণআন্দোলনগুলি পরিচালনার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের অমোঘ সংঘশক্তি গড়ে তুলতে পারলেই শ্রমজীবী জনসাধারণের 'ইনকিলাবে'র স্বপ্ন একদিন বাস্তবে সফল হবে।

সেই আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তোলাটাই হচ্ছে মূল কথা। সেই আন্দোলন ও সংগঠন অতি দ্রুত গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যেই 'মজুরদের আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না' — এই নীতি নির্ধারিত হয়েছে, মজুরদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যও নয় বা কোন রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ পার্টি স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেও নয়। কাজেই রাজনৈতিক ঐ উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থে যদি সরকারের এই বৈপ্লবিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণাটিকে শ্রমিকরা অযথা অপব্যবহার করেন তাহলে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারবেন। এই কথাটা শ্রমিকদের মনে রাখা দরকার। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ঘটনাকে বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার। একটা কথা কোনমতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ভারতবর্ষের এই সমাজে যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজিপতিদের অবাধে ব্যবসাবাণিজ্য চালানো এবং পুঁজিবাদী জুলুম ও শোষণের অধিকার অব্যাহত থাকবে ততক্ষণ কোনও মন্ত্রী, কোনও সরকার — তা সে যত আইন প্রবর্তন করুক, যত অধিকার শ্রমিকদের দিক, শ্রমিকদের মুক্তি তার দ্বারা অর্জিত হতে পারে না। একমাত্র পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের সংগঠন গড়ে তুলে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের মুক্তি অর্জিত হতে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান সরকারের প্রগতিশীল শ্রমনীতির তাৎপর্যকে বুঝতে হবে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যতক্ষণ এই সরকার আছে, এই শ্রমনীতি আছে, ততক্ষণে দ্রুত শ্রমিকদের নিজেদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে হবে,

রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে, সংগঠনকে বিরাট আকারে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে হবে দেশের অভ্যন্তরে। এই একটা সুবর্ণ সুযোগ। আমরা যদি এই সময়ের সদ্ব্যবহার করে সংগঠিত হতে না পারি, জনসাধারণকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে না পারি তাহলে আক্রমণ আবার যখন আসবে তখন আমরা আবার ছত্রখান হয়ে যাব। তখন তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ও দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলবার ক্ষমতা আমাদের থাকবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, শ্রমনীতির এই তাৎপর্য বুঝতে না পেরে সংগঠনের ও জনগণের রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে আন্দোলনের নামে ঠিক উল্‌টো জিনিসটি হচ্ছে। এ একটা অবাক কাণ্ড! অন্যেরা করলেও আপনাদের শ্রমিকদের এইটা একটা অবশ্য দায়িত্ব অপরকে বোঝানো যাতে এই নীতির অপব্যবহার না হয় — যাতে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে, অথবা ইউনিয়নের ক্ষুদ্র স্বার্থে অথবা ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থে এ নীতির সুবিধা কেউ না নেয়। আপনারা একটু ভেবে দেখুন, ঘেরাও যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের আগেও হয়েছে, এমনকী তীব্রতায়ও এর চাইতে বিরাট আকারে হয়েছে। কিন্তু মালিকপক্ষ এই ঘেরাও নিয়ে আগে এত হট্টগোল করেনি। 'ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না'—এই ঘোষণাটির পর থেকেই তারা এত হট্টগোল করছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ঘেরাও নিয়ে যত চিৎকারই তারা করুক, তাদের আক্রমণের আসল লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের এই ঘোষিত নীতিটিকে বানচাল করা।

কাজেই এতবড় একটা ঘোষণা যা মালিকের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে, তা কি একটা ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহৃত হবার জন্য তৈরি হয়েছে? না, এটা তৈরি হয়েছে গোটা পশ্চিম বাংলার শ্রমিক সাধারণকে এই সুযোগে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বৈপ্লবিক চেতনায় সংঘবদ্ধ করে তোলা, গণআন্দোলনগুলিকে উন্নততর করে তোলা এবং লৌহদৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে — যাতে কোন সময়ে, কোন ষড়যন্ত্রে এই সরকারকে ভেঙে দেওয়ার যদি চেষ্টা হয় তাহলে সেই সংঘবদ্ধতার জোরে আমরা তাকে রুখতেও পারি। কিন্তু বর্তমানে যা হচ্ছে তাতে কালই যদি আক্রমণ আসে এই সরকারকে ফেলে দেওয়ার, তাহলে দেশের মানুষ দু'দিন রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঢিল-পাটকেল মারতে পারবে, আর কিছু করতে পারবে কি? আর কিছু করার ক্ষমতা আছে কি? সমস্ত শ্রমিকসমাজ — যাদের উপকারের জন্য এতবড় একটা নীতি ঘোষিত হ'ল যদি মালিকদের আক্রমণে, কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণে বা কায়েমি গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ আক্রমণের সামনে এই সরকারকে হটে যেতে হয় তাহলে আজ যে অবস্থায় শ্রমিকসমাজ আছেন তাকে কি তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন? আছে তাঁদের সেই সংগঠন-শক্তি? নেই।

দু'দিন বড় জোর রাস্তায় ঢিল-পাটকেল ছোঁড়া হবে, কিন্তু এ ঢিল-পাটকেল-পটকাকে ওরা ভয় পায় না। ওদের সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তি, ওরা তাতে এতটুকু ভয় পায় না। ওরা বরঞ্চ চায়, অসংগঠিত অবস্থায় ঢিল-পাটকেল এবং পটকা ছোঁড়া হোক। তাতে তাদের আরও সুবিধে। কারণ তাহলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে দমন ও নিপীড়নের স্টিমরোলার তারা আরও দৃঢ় হাতে চালাতে পারবে এই সবগুলোর দোহাই দিয়ে, তাদের অত্যাচারী যন্ত্রটাকে আরও শক্তিশালী করতে পারবে। মধ্য সম্প্রদায়ের লোক যারা, মালিক আর মজুরের মাঝখানে সাধারণ মানুষ যারা তাদের এই সমস্ত ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে প্রতিক্রিয়ার দিকে টেনে নিতে সুবিধে হবে। মজুরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে ব্যাপক জনসাধারণ, বাইরের জনসাধারণ থেকে। সেইজন্য এতে ওরা ভয় পায় না।

কিন্তু ভয় পায় ওরা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংযমী শক্তিশালী সংগঠনকে। সে লড়বে যখন, এক ইঞ্চি জমি থেকেও তাকে হঠাতে পারবে না। ঢিল-পাটকেলই হোক আর যা দিয়েই শুরু হোক, সে লড়াই রাস্তায় কতগুলো লোকের বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ নয় — এটা একটা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ। ঢিল-পাটকেল দিয়ে তা শুরু হতে পারে এবং শেষপর্যন্ত সেই লড়াই একেবারে চূড়ান্ত শক্তির মোকাবিলায় যেতে পারে। দৈনন্দিন আন্দোলনগুলো পরিচালনার মধ্য দিয়ে সেইভাবে রাজনৈতিক চেতনাবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলাই হ'ল বর্তমান শ্রমনীতির তাৎপর্য। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, দেশের শ্রমিকসমাজ সে সম্বন্ধে মোটেই ওয়াকিবহাল নন। শুধু যে শ্রমিকসমাজ ওয়াকিবহাল নন তাই নয়, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা, বিভিন্ন পার্টির নেতা ও কর্মী — যাঁরা ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে পরিচালনা করেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা এই শ্রমনীতিকে খুব 'প্রগতিশীল', 'প্রগতিশীল' বলে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাচ্ছে, তারাও কি 'দ্য ইনার মিনিং, দ্য সিগ্‌নিফিকেন্স, দ্য ট্রিমেন্‌ডাস রেভোলিউশনারি ইম্‌পরটেন্স অব দিস ডিক্লারেশন' (এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, এই প্রগতিশীল নীতির সুদূরপ্রসারী বিরাট বৈপ্লবিক তাৎপর্য) যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন? আমি মনে করি, না। তাঁদের ব্যবহার থেকে মনে হয় তাঁরা বিন্দুমাত্রও এর তাৎপর্য বোঝেননি। তাঁরা শুধু বুঝেছেন কী করে এর থেকে আশু সংকীর্ণ দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করা যায়। এতবড় একটা সুযোগ পূর্বে কখনও দেখা যায়নি, এমনকী কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারও এ জিনিস করতে সক্ষম হয়নি। কোনদিন কেউ আশা করেনি যে, জনসাধারণ যখন ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন করবে পুলিশ আসতে পারবে না — সরকারের গদিতে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা যতক্ষণ সরকারি গদিতে বসে থাকবেন ততক্ষণ এ জিনিস ঘটতে পারবে না, তাঁরা ঘটতে দেবেন

না। এর মানে কি এই দাঁড়ায় — তাঁরা যা করে চলেছেন — যে, অমুক ম্যানেজার এই কথা বলেছে কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘেরাও করা হ'ল। চব্বিশ ঘণ্টা পান থেকে চুন খসতে না খসতে ঘেরাও হচ্ছে বা এমন কিছু হচ্ছে যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে সুযোগ পেয়ে শ্রমিকদের মূল কার্যধারা যেদিকে যাবার কথা — অর্থাৎ শ্রমিকদের সম্মেলন করা, ক্লাস করা, ন্যায্য দাবিগুলোর ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ বড় বড় আন্দোলন গড়ে তোলা, মিটিং গড়ে তোলা, মিছিল করা যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের এই নীতির তাৎপর্য বোঝানো যায়, তা হচ্ছে না। এই শ্রমনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে একদিকে ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন চালানো অথচ উগ্রতা না করা, মালিককে কোন সুযোগ না দেওয়া যাতে এর সুযোগে জনমতকে বিভ্রান্ত করে আইন-শৃঙ্খলার নামে তারা সরকারের প্রগতিশীল নীতিকে বানচাল করে দিতে পারে; আর অন্য দিকে মালিক ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর যে চক্রান্ত চলছে সে সম্বন্ধে রাজনীতির চর্চার দ্বারা সমস্ত মজুর সমাজকে দ্রুত ওয়াকিবহাল করে তোলা, সাজ সাজ রবে সমস্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করা, দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করা, কমিটিতে কমিটিতে সংঘবদ্ধ করা, তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা — আক্রমণ আসছে তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে, তাকে রুখতে হবে। আর এখন এই প্রচার করা, সংগঠন করা, ট্রেড ইউনিয়ন করা, মিটিং করা, মিছিল করা, দরকার হলে ধর্মঘট করার অফুরন্ত সুযোগ। এজন্য সুযোগ যে, শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করে বলে পুলিশ তাদের ঘাড়ের উপর এসে চেপে বসতে পারবে না। ঘেরাও পর্যন্ত করতে হবে যখন দরকার, যখন ঘেরাও ছাড়া আর কোনও উপায় নেই মালিককে দিয়ে ন্যায়সঙ্গত দাবিটা মানানোর বা মূল আন্দোলনটাকে রক্ষা করার তখন ঘেরাও করতে হবে, তা প্রচলিত আইনের চোখে আইনসঙ্গত হোক বা না হোক। সেখানেও শ্রমিকরা 'প্রোটেকশন' (সাহায্য) পাবেন, এই হচ্ছে সরকারের পরিষ্কার ঘোষণা। কিন্তু শ্রমিকরা যদি অযথা উগ্র আচরণ করেন, তাদের নিজেদেরই যদি এই রাজনৈতিক ধীশক্তি না থাকে, ধৈর্য না থাকে যে কোন্‌টা উগ্রতা হচ্ছে, কোথায় ব্যক্তিগত স্বার্থে, ক্ষুদ্র স্বার্থে এর ব্যবহার হচ্ছে — এর রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা যদি তাদের মধ্যে খুব ভালভাবে না হয় তাহলে এই প্রগতিশীল শ্রমনীতির সমর্থনে হাততালিতে কোনও কাজ হবে না। কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না, ঈশ্বরও পারবে না। আজ প্রগতিশীল শ্রমনীতির পেছনে হাততালি দেওয়া হচ্ছে, কাল আবার আপনারা হয়ত খেপে গিয়ে একে গালাগালি দিতে সুরু করবেন। চিরকাল ধরে এই দেশে যা হয়ে এসেছে তাই হবে।

আমি 'প্যাট' (তোষামোদ) করা একেবারে পছন্দ করি না। সুড়সুড়ি দেওয়া

একদম পছন্দ করি না। সত্য কথা বলছি, ভাল লাগে আপনারা ভাবুন। না বোঝেন, না ভাল লাগে মানবেন না। কিন্তু কথাটা সত্য। কী এদেশে হয়? খুশি হলেই হাততালি। মাথা খাটানো হয় না। কিন্তু একথা সবাই বলে যে, শুধু পেশীতে কাজ হয় না, উত্তেজনায় কাজ হয় না — বুদ্ধি চাই, মগজ চাই। আর এই মগজ হচ্ছে নেতৃত্ব। তাই শ্রমিকসমাজকে ভাবতে হবে, পড়তে হবে, চিন্তা করতে হবে, কাজ করতে করতে দিনরাত রাজনীতির চর্চা করতে হবে। যারা বলে মজুররা রাজনীতি করবে না, মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রাজনীতি ঢোকানো উচিত নয় তারা জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ। তারাও একদল পরজীবী যারা মজুর ইউনিয়ন করে বাড়িঘর করে, মোড়লি করে বেড়ায়, অথবা কর্তৃত্ব করে বেড়ানোই যাদের পেশা এবং নেশা। তারা এই মিথ্যা কথাটা ছড়ায় যে, ট্রেড ইউনিয়নে রাজনীতি ঢুকিও না। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে স্কুল, রাজনীতি শিক্ষার শিবির, মার্কসের ভাষায় — যে মার্কস-এঙ্গেলস-এর ছবি শ্রমিকেরা টাঙান, সমস্ত লাল ঝান্ডাওয়ালারা টাঙায়। তিনি বলছেন, এই ট্রেড ইউনিয়নগুলো কী? একটা কথায় তিনি তাকে প্রকাশ করেছেন। লড়াই-টড়াই, হাতিয়ার-টাতিয়ার এত কথায় তিনি যানইনি। এ তো আছেই। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে 'স্কুল অব কমিউনিজম' — কমিউনিজমে শিক্ষিত হবার, শিক্ষা গ্রহণ করবার একটা 'ম্যাসিভ' (বিরাট) রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির। এই হ'ল ট্রেড ইউনিয়ন। এই ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে যদি এই শিক্ষাশিবির হিসাবে না দেখা হয়, এগুলো রাজনীতি চর্চার একটা প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে না ওঠে তাহলে এই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলো শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অস্ত্রে পর্যবসিত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির বদলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলো শেষপর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনীতিবাদ বা সুবিধাবাদের জন্ম দিয়ে থাকে।

অর্থনীতিবাদ বা 'ইকনমিজম', যাকে মজুর আন্দোলনে আমরা এককথায় সুবিধাবাদ বলে থাকি, মজুরদের এই সুবিধাবাদ মালিকদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ আর মজুরের পক্ষে মৃত্যুর সামিল। মজুর খেতে পায় না বলে তার সুবিধাবাদটা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় না — একথাটা মনে রাখা দরকার। মালিক লুট করে বলে তার সুবিধাবাদ তো আরও খারাপ। কিন্তু শ্রমিক খেতে পায় না বলে তার সুবিধাবাদটাও মানবিক বা যুক্তিসঙ্গত হয়ে যায় না। কাজেই মজুরকেও নিজ শ্রেণীস্বার্থেই তার এই অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। মজুরদের বেঁচে থাকতে হলে দাবি মেটানো চাই, তার দাবি আদায়ের জন্য লড়াই দরকার।

কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। এই যদি লড়াইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, আর এই উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েই যদি ইউনিয়ন পরিচালনা করা হয় তাহলে সেসব ইউনিয়নগুলো শুধু সুবিধাবাদী শ্রমিকের জন্ম দেবে। সচেতন, সত্যিকারের দেশ-দরদী, সত্যিকারের বিপ্লবী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ, মুক্তিআন্দোলন পরিচালনা করবার যোগ্য শ্রমিকের জন্ম তারা দিতে পারে না। কাজেই শ্রমিক সম্মেলনগুলোকে সেই দিকে নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে, শ্রমিক আন্দোলনকে সেইভাবে পরিচালনা করার দরকার আছে, শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে সেইদিকে পরিচালিত করার দরকার আছে।

অথচ দেখা যায়, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের প্রাত্যহিক ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম কী? মজুররা রোজ 'ইয়ে মাংগ্ ক্যা হ্যায়, উয়ো মাংগ্ ক্যা হ্যায়, ইয়ে রূপেয়া মিলেগা ইয়া নহি, আপ কুছ্ বন্দোবস্ত্ কিজিয়ে' — এরকম বলে। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন কর্তাদের অমুককে ধরে একটা বন্দোবস্ত করে দেবার কথা বলে। মানে তেল দেবার কথা বলে। সোজা কথায় বলে আপনি নাম করা লোক, আপনার প্রভাব আছে, আপনি একটু অমুককে ধরে বন্দোবস্ত করে দিন। এই কথা নেতাকে বলে। আর নেতারাও তাই করে। কারণ নেতারা হচ্ছে, যে যত তেল দিয়ে এরকম ম্যানেজ করে দিতে পারে সেই সবচাইতে বড় নেতা। শ্রমিকদের মধ্যে এরকম ধারণা হয়ে গেছে যে, অমুকের কাছে গিয়ে লাভ নেই। কারণ অমুকের থেকে অমুকের তেল দেওয়ার ক্ষমতা বেশি। ওর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল, ওর ধরাধরির ক্ষমতা বেশি — একথার মানে হ'ল ওর তেল দেওয়ার ক্ষমতা বেশি। কাজেই ওর কাছে গেলে তাদের দাবি মিটে যাবে। এসব মনোভাব কী? এ সুবিধাবাদ নয়? এতে মজুরের নৈতিকতা থাকে? এখানে শ্রমের মর্যাদাবোধ কোথায়? তাহলে বড় বড় কথা, হাততালি, লড়াই, এতসব কথার দরকার কী? যে মজুর শ্রমের মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলে এইরূপ সুবিধাবাদের খপ্পরে পড়েছে, সে মজুর কী করবে? সে মজুর তো মার খাবেই। সে মজুর কি মানুষ? আমি সেই মজুরের পক্ষে যে মজুরের সম্ভ্রমবোধ আছে, যে মজুরের ইজ্জতবোধ আছে, যে মরবে তবু ইজ্জত দেবে না, যে লড়াই করে আদায় করবে, যে সচেতন মজুর। যে দালাল মজুর সে মজুর বলেই তার প্রতি আমার মমতা নেই। একথাটা মনে রাখা দরকার এবং এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া দরকার। তবেই ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের ঊর্ধ্বে শ্রমিকরা উঠতে পারবেন। তবেই শ্রমিকরা এই শ্রমনীতির যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। এই শ্রমনীতির তাৎপর্য হচ্ছে, এ একদিকে যেমন শ্রমিকদের দৈনন্দিন দাবিদাওয়ার আন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়তা করবে, অন্যদিকে এর চেয়ে বড় তাৎপর্য হচ্ছে যে, এই সুযোগে শ্রমিকরা তাদের মনোমতো

রাজনৈতিক চর্চার দ্বারা, আন্দোলনের দ্বারা একটা সঠিক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবেন। ফলে সেইটা নিতে হবে, সেইদিকে অনতিবিলম্বে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করতে হবে। জীবনধারণের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই এগুলো তো আছেই — যেমন মলমূত্র ত্যাগ করা আছে, বাজার করা আছে, যেমন ছেলের অসুখ হলে ওষুধের দোকানে দৌড়ানো আছে। অর্থাৎ দাবির প্রশ্ন আছে এবং তা না পেলে লড়াই আছে। কিন্তু তা রাজনীতিকে দূরে ঠেলবে কেন? মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে শ্রমিকদের অনীহা থাকবে কেন? অনিচ্ছা, ঔদাসীন্য থাকবে কেন? একটা জিনিস প্রায়ই দেখা যায়, রাজনীতির কথা এলেই ঝিমুনি পায়। দেশের কথা, আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেই ঝিমুনি পায়। কিন্তু 'অমুক দাবির কী হবে', 'তার তদ্‌বিরটা ঠিকমত হচ্ছে কিনা', এসব কথা উঠলেই মজুররা খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে। আপনারাই বলুন, আমি ঠিক বলছি কি না। অথচ এই মনোভাবকে যদি আপনারা দূর না করতে পারেন তাহলে আজ যে মজুর, কাল তার ছেলে আরও খারাপ মজুর, তার ছেলে অর্থাৎ তস্য নাতিটা একেবারে বেকার মজুর, হদ্দ মজুর। জীবনেও সে মুক্তি পাবে না। একবারও কি ভেবেছেন, কী জবাব আপনারা আপনাদের ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে দেবেন? আপনি মজুর, আপনি 'সিভিলাইজেশন'-এর স্রষ্টা, এ সভ্যতার স্রষ্টা। আর এই সভ্যতা মুক্তিবেদনায় কাঁপছে, সে আপনাদের কাছে মুক্তি চাইছে। শুধু আপনাদের মুক্তি নয়, গোটা মানবসভ্যতার মুক্তি আপনাদের হাতে। তার দায়িত্ব শ্রমিকের হাতে। অথচ আপনাদের, শ্রমিকদের সে সম্বন্ধে আজও এতটুকু চেতনা নেই। সেই চেতনা যদি শ্রমিকদের মধ্যে না আসে, সেই চেতনায় শ্রমিকরা যদি উদ্বুদ্ধ না হতে পারেন তাহলে সব ব্যর্থ। তাহলে এর কোনও মানে নেই। কাগজেপত্রে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করার কোনও মানে নেই।

কাজেই আমার সর্বশেষ আবেদন দেশের শ্রমিকভাইদের কাছে — সত্যিকারের বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি আপনাদের গড়তে হবে, নিয়মিত পার্টির কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ নিরুৎসাহকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। হাজার কাজের মধ্যে পড়াশুনা করতে হবে, তর্ক-বিতর্ক আলাপ-আলোচনা করতে হবে, নিয়মিত পার্টির ক্লাসগুলোতে যেতে হবে। এসব সম্পর্কে বিমুখতা যারা প্রকাশ করবে তাদেরই চেপে ধরতে হবে। শ্রমিককে একথা বুঝতেই হবে, আজ যে দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে সে চলছে সেই দুঃসময়ে সে বাঁচতে পারে, দেশকে বাঁচাতে পারে, যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং তার প্রগতিশীল শ্রমনীতিকে বাঁচাতে পারে যদি সে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, সংঘবদ্ধ হয় একটি বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে একটি অটল, সুদৃঢ় হিমালয় পাহাড়ের মতো। আর এদেশে একমাত্র

এস ইউ সি আই-ই সত্যিকারের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দল — একথা যেন এক মুহূর্তের জন্যও আপনারা না ভোলেন। এই দলকে আপনাদের চোখের মণির মতো মনে করতে হবে। তাহলে শ্রমিকরা বাঁচবে, দেশও বাঁচবে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকেও কেউ হটাতে পারবে না, তার প্রগতিশীল শ্রমনীতিও থাকবে, আন্দোলনও বাড়তে থাকবে। আর এই আন্দোলনগুলো বাড়তে বাড়তে একদিন পুঁজিবাদকে খতম করা সম্ভব হবে, পুঁজিবাদকে পাল্‌টে মজুরশ্রেণীর রাজ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মজুরদের স্বপ্ন একদিন বাস্তবে নিশ্চয় সম্ভব হবে এবং সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়। সর্বশেষে এই সম্মেলনে উপস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকভাইদের প্রতি বিপ্লবী অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

শ্রমিকের কাছে সর্বহারা রুচি সংস্কৃতি তুলে ধরতে হবে

১৯৭৪ সালে, দুর্গাপুর স্টিল-ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম সম্মেলনে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই ভাষণ দেন। বর্তমান মুহূর্তে মেকি মার্কসবাদীদের অর্থনীতিবাদ সর্বস্ব আন্দোলন যখন গণমুক্তির জন্য অপরিহার্য বিপ্লবী সংগ্রামের পথ থেকে শ্রমিকদের পিছনে টানছে, সেই সময়ে এই ভাষণ তার বিরুদ্ধে এক অমূল্য দলিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ এ দেশের পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের অবসানকল্পে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার প্রয়োজনীয় মূল রাজনৈতিক লাইনের রূপরেখাটি তুলে ধরতে গিয়ে কীভাবে শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে, তারও ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে আধুনিক সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদ এবং বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া পঙ্কিলতা, বিচ্যুতি ও নীতিভ্রষ্টতার হাত থেকে শ্রমিক জনতাকে মুক্ত করতে শ্রমিক আন্দোলনগুলি যাতে উন্নত রুচি-সংস্কৃতি-নীতি-নৈতিকতা অর্জনের সংগ্রামের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, তার উপরও বিশেষ জোর দেন।

কমরেড সভাপতি ও উপস্থিত বন্ধুগণ,

দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কারদের এই সমাবেশে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বর্তমান অবস্থায় শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের করণীয় কী এই নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের এই প্রকাশ্য অধিবেশনে আমাকে যে কিছু বলতে বলা হয়েছে এর জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথমেই যে কথাটা আমি আপনাদের বলতে চাই তা হ'ল এই যে, সকলেই একটা কথা অনুভব করছেন, প্রত্যেকেই একটা কথা ভাবছেন, যার যেমন উপলব্ধি হোক না কেন ভাবছেন যে, চারদিকে দেশের অবস্থার এমন অবনতি ঘটছে কেন? যে কথাটা কমরেড ব্যানার্জী* বলে গেলেন যে শুধু অর্থনৈতিক

* কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী — সভার প্রধান অতিথি

ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিশেষ করে জাতির নৈতিক দিকটার প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যাবে পরিস্থিতি সত্যিই আঁতকে ওঠার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা কথা আমি আপনাদের না বলে পারছি না যে, না খেয়ে থেকেও, শোষণে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও, দিনের পর দিন অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় থাকার পরেও একটা জাতি উঠে দাঁড়াতে পারে, লড়তে পারে, লড়বার শক্তি অর্জন করতে পারে, সংগঠিত হতে পারে, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে — যদি সেই জাতির নৈতিক বল অটুট থাকে এবং জনসাধারণের সামনে একটি সঠিক আদর্শ খাড়া থাকে। ভিয়েতনামের দিকে চেয়ে দেখুন, চীন বিপ্লবের ইতিহাস পড়ুন, প্রাক্-বিপ্লব চীনের মানুষের আর্থিক দুর্গতি, অত্যাচার, শোষণ কী চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল স্মরণ করুন। কিন্তু তবু সেই সমস্ত দেশের মানুষ এবং জনশক্তি উঠে দাঁড়াতে পেরেছে। পেরেছে একটা জিনিসকে কেন্দ্র করে। সেটা হচ্ছে — এত অত্যাচার, লাঞ্ছনার মধ্যেও জনগণের চরিত্রে, জাতির চরিত্রে খানিকটা নৈতিক বল পুরনো নীতি-নৈতিকতাকে কেন্দ্র করে হলেও সমাজ-অভ্যন্তরে বজায় ছিল এবং এটাই জনসাধারণকে সঠিক বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ করতে এবং সেই অনুযায়ী সংগ্রামের উপযোগী নতুন নৈতিক বল অর্জন করতে সক্ষম করে তুলেছিল। তাই ভিয়েতনামের মানুষকে বোমা মেরে ধ্বংস করা গেল না। গোটা দেশকে মরুভূমি বানিয়ে দিয়েও সেই দেশের নিরন্ন বুভুক্ষু অশিক্ষিত চাষী এবং জনসাধারণের মাথাকে নোয়ানো গেল না। বারো-তেরো বছরের কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত মরণপণ করে লড়বার এই তেজ পেল কোত্থেকে? তারা কি সকলেই লেনিন-স্ট্যালিন? তারা কি সকলেই বিপ্লবের সমস্ত তত্ত্ব সুন্দরভাবে বুঝে গিয়েছিল নাকি? এতো অবাস্তব কথা। কিন্তু একটা জিনিস তাদের ছিল ও আছে যেটিকে ভিত্তি করে সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে অমিত তেজে তারা খাড়া হতে পেরেছিল।

ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় জাতির সেই নৈতিক চরিত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা অত্যন্ত ধুরন্ধর। তারা জানে যে শত অত্যাচার ও দমনপীড়ন করেও, না খেতে দিয়েও একটা জাতিকে, একটা দেশের জনসাধারণকে শুধু পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে বেশিদিন পদদলিত করে রাখা যায় না। সমস্ত যুগের 'ডেসপট'-দের (স্বৈরাচারী শাসকদের) অত্যাচারের ইতিহাস একটি কথা বাতলায় যে শোষণ এবং দমন দিয়ে, পুলিশি শাসন ও মিলিটারি শক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত জনশক্তিকে দমানো যায় না, ক্ষমতা রক্ষা করা যায় না। জনশক্তি মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়ায় যদি তারা সঠিক বিপ্লবী আদর্শের হদিশ পায় এবং

তাদের নৈতিক বল অটুট থাকে।

ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা, শাসক সম্প্রদায়েরা ইতিহাস থেকে ভাল শিক্ষাটি নেয়নি। কিন্তু শয়তান শাসক-শোষক হিসাবে তাদের যেটি দরকার ছিল, সেই কার্যকরী শিক্ষাটি কিন্তু ঠিক তারা নিয়েছে। সেটি হচ্ছে জাতির নৈতিক বল খতম করে দাও, জাতির চরিত্রকে মেরে দাও। তাহলে তারা না খেতে পেয়ে, শত অত্যাচারেও কুকুরের মত গুমরাতে থাকবে, ক্ষোভ প্রকাশ করবে, হয়ত কখনও বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহও করবে; কিন্তু সংগঠিত বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ম দিতে পারবে না — বিপ্লব সংগঠিত করতে পারবে না। কেননা বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ এবং বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইন এবং সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব ছাড়াও যেটি অপরিহার্য সেটি হ'ল নৈতিক বল।

বাস্তব রাজনীতির দোহাই দিয়ে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে মানুষের মধ্যে নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে বাড়িয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত

তাই এই যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় দেখছেন, এটা একটা 'অ্যাক্সিডেন্ট' নয়। 'স্পন্টেনিয়াস' (স্বতঃস্ফূর্ত) 'সামথিং' (কিছু একটা) নয়। এমন একটা ব্যাপার নয়, যেটা পূর্ব নির্ধারিত একটা 'ফ্যাটালিস্টিক' (অবশ্যম্ভাবী) ঘটনা — যেন হওয়ারই কথা ছিল, যেটা হবেই এবং তাই হচ্ছে। গভীরে গিয়ে দেখলে ধরা পড়বে, যদিও এটা ঘটছে লোকচক্ষুর অন্তরালে তবুও এর পিছনে রয়েছে শাসক সম্প্রদায়ের একটা পরিকল্পনা এবং প্রশ্রয়। মানুষকে এরা মুখে বলছে সৎ হও, ভাল হও। অথচ 'প্র্যাক্টিক্যাল পলিটিক্স্'-এর (বাস্তব রাজনীতির) দোহাই দিয়ে ক্ষুদ্র পার্টি স্বার্থে শুধু আশু প্রয়োজনটাকে সামনে রেখে, শাসকদলই শুধু নয়, বিপ্লবের তক্‌মাধারী অনেক দলই মানুষের মধ্যে যে নীচ প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে তাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবৃত্তিকে, দশজনে মিলে একজনকে মারার হীন কার্যকলাপকে, তত্ত্ব আলোচনা যুক্তিবিচারের বদলে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতিকে সংগ্রাম ও লড়াই-এর নামে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। লোভ-লালসা ও নীচতা, যা একটা মানুষকে অমানুষ করে, তার বীরত্ব এবং যথার্থ মর্যাদাবোধকে নষ্ট করে দেয়, তাকেই আজ প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। টাকার বিনিময়ে কর্মীদের দিয়ে পার্টির বা ইউনিয়নের নিয়মিত কাজ করানো হচ্ছে এবং নির্বাচনের কাজ করানো হচ্ছে। এ সবই চলছে আজ বাস্তব রাজনীতির দোহাই দিয়ে। লক্ষ লক্ষ বেকারে আজ সারা দেশ ভরে গেছে, পেট চলছে না মানুষের। সেই সুযোগে এই রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ব্যবহার করছে, এইভাবেই তাদের 'এমপ্লয়মেন্ট'(চাকরি) দিচ্ছে! আপনারা জানেন যে, সব মানুষই দোষে গুণে

মিশিয়ে মানুষ। মানুষের মধ্যে যে সমস্ত ভাল দিক রয়েছে অর্থাৎ তার মধ্যে যে সব ভালর দিক — সাহস, বীরত্ব, সহানুভূতি, উদারতা ও কর্তব্যের দিক রয়েছে, সেই দিকগুলোকে বাড়াতে সাহায্য করেই একমাত্র তার দোষকে দূর করা যায়। শুধুমাত্র দোষকে দূর হতে বললেই তা দূর হয়ে যায় না, বা মানুষকে সৎ হও, ভাল হও বললেই মানুষ সৎ ও ভাল হয় না। অথচ একদিকে সৎ হও, ভাল হও বলে এই উপদেশ আর অন্যদিকে বাস্তব রাজনীতির দোহাই পেড়ে যারা বা যে দলই হোক্ না কেন, বুক্‌নি তাদের যাই হোক্ না কেন — মানুষের মধ্যে নীচ প্রবৃত্তিগুলোকে উস্কানি দিয়ে এবং এর দ্বারা তারা জেনে হোক্, না জেনে হোক্, নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে সৎ হোন বা অসৎ হোন সেটা অত বড় প্রশ্ন নয়, এর দ্বারা তারা আসলে গোটা দেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশকে, জাতির নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করার বুর্জোয়াশ্রেণীর যে ষড়যন্ত্র তাকে সফল হতে সাহায্য করছেন।

লুম্পেন ও ভিক্ষুকরা কোন দেশে বিপ্লব করে না — আদর্শ ও রাজনীতি সচেতন সংগঠিত শোষিত জনতাই বিপ্লবের শক্তি

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে তো জাতির নৈতিকতা মরবেই। আর নৈতিকতা বাদ দিয়ে বিপ্লব হয় না। যাঁরা মনে করেন যে, মানুষের আর্থিক দুর্গতি এবং তাদের ওপর জুলুম নিপীড়ন বাড়লেই আপনা-আপনি বিপ্লব হয়ে যাবে — আমি বলব তাঁরা মূর্খ। তাঁরা জানেন না যে, কোন দেশে কোনদিনই ভিক্ষুকরা বিপ্লব করে না। বিপ্লব করে শোষিত জনসাধারণ। এ কথাটার একটা মানে আছে। 'লুম্পেন'-রা (নষ্ট চরিত্ররা) বিপ্লব করে না। বরং সর্বদেশেই লুম্পেন-রা বুর্জোয়াদের হাতে, ফ্যাসিস্টদের হাতে বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার বাহিনী হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তাই মার্কস্ থেকে লেনিন, মাও সে-তুং সকলকেই বলতে হয়েছে যে আর্থিক দুর্গতির জন্য প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে যারা লুম্পেন বনে যাচ্ছে, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা সর্বহারা বিপ্লবী নয়। বিপ্লবী সর্বহারাকে বিপ্লবের জন্যই এই 'লুম্পেনিজম্'-এর (লুম্পেনির) বিরুদ্ধে লড়তে হয়। তাই অভাব থাকলেই তার থেকে বিপ্লব ফেটে পড়ে না। ফেটে যা পড়ে তা বিক্ষোভ। তার দ্বারা শেষ পর্যন্ত শোষকদেরই লাভ হয় বেশি। রাস্তা ভুল, নেতৃত্ব ভুল, তত্ত্ব ভুল, বিপ্লব সম্বন্ধে স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই এমন অসংগঠিত জনসাধারণের লড়াই যখন সংগঠিত রাষ্ট্রের দমনের সামনে পর্যুদস্ত হয়, তখন আসে 'ডিফিটিজম' (পরাজয়ের মনোভাব)। মানুষের মধ্যে যে লড়াইয়ের প্রবণতা ছিল তা এইভাবে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ফলে হতাশা ও পরাজয়ের মনোভাব গণআন্দোলনগুলিকে কিছুদিনের জন্য হলেও গ্রাস করে বসে। ফলে শোষক

সম্প্রদায়ের হয় সবচেয়ে সুবিধা। এই সুযোগে শোষক সম্প্রদায় তাদের কাজটাকে গুছিয়ে নেয়। তাদের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংগঠনকে আরও খানিকটা মজবুত করে তোলে।

একটু চোখ বুজে আমাদের দেশের ইতিহাসটা ভাবতে থাকুন, দেখবেন এ দেশে লড়াই বার বার হয়েছে। এ কথা তো কেউ বলতে পারবে না যে এদেশের যুবকরা, শ্রমিকরা, দেশের মেহনতী জনসাধারণ লড়তে চায়নি, ময়দানে লড়তে নামেনি, জেলে যেতে তারা ভয় পেয়েছে, জান দিতে তারা ভয় পেয়েছে, কোরবানি করতে ভয় পেয়েছে। এ কথা বলার সাহস কারোরই হবে না। যাঁরাই ইতিহাস জানেন, তাঁরাই জানেন যে এদেশে মানুষ বার বার লড়বার জন্য বারুদের মত ফেটে পড়েছে। স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরেও গত ২৭ বছরের মধ্যে শুধু এই পশ্চিমবঙ্গেই নয়, গোটা ভারতবর্ষে কত আত্মত্যাগ, কত রক্তপাত না হয়েছে, শ্রমিক চাষী ও নওজোয়ান ছাত্র-যুবকরা কতবার না দিয়েছে আত্মাহুতি। বিপ্লবের জন্য কী প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বার বার এ দেশের মানুষ আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। অথচ তার ফল কী হয়েছে? সকলেই আজ বলছেন প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আক্রমণ হচ্ছে, ফ্যাসিবাদি আক্রমণ হচ্ছে। কেন এমনটা হোল? কেন এমন হচ্ছে? গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তো এতদিনে ড্যাং ড্যাং করে পুঁজিবাদকে খতম করে বিপ্লবের জয়ডংকা বাজানোর কথা! কারণ, বিপ্লবের জন্য যা দরকার সেই জনসমর্থন তো জনগণ দিয়েছিল। নেতাদের ডাকে হাজার হাজার নওজোয়ান বিপ্লবের আশায় ঝাঁপিয়েও পড়েছিল আন্দোলনে। তাহলে আবার প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হ'ল কেন? বিপ্লবেরই তো শক্তিশালী হওয়ার কথা ছিল। ঈশ্বর করে দিল নাকি? 'মিস্টিসিজম' (মায়া) নাকি? মন্ত্র তন্ত্র আছে নাকি? মন্ত্র তন্ত্র বলে হয়তো তাদের কিছু থাকতে পারে যাঁরা তা বিশ্বাস করেন। কিন্তু মন্ত্র তন্ত্র বলে যদি কিছু না থাকে আর আল্লা বা ঈশ্বরের খেয়াল বলেও যদি কেউ মনে না করেন, তাহলে এটা ঘটছে কেন? এটাই হ'ল আসল প্রশ্ন।

শুধু অর্থনৈতিক দাবি আদায় নয়, শ্রমিকদের মধ্যে যথার্থ বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়াই বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোর মূল কাজ

এখানে আমি প্রথমেই লেনিনের একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। মজুরদের লেনিন বার বার একটি বিষয়ে 'ওয়ার্ন' (সাবধান) করেছেন। মার্কস থেকে শুরু করে সকলেই বার বার এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন। তাঁরা

বলেছেন যে, শুধু অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া নিয়ে শ্রমিকরা যতই মারমুখী লড়াই করুক না কেন, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে যতই তারা তাদের দাবি ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করুক না কেন, তাতে তাদের গোলামির অবসান হয় না — তারা যে গোলাম সেই গোলামই থেকে যায়, যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকে। শুধু অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া নিয়ে লড়লেই আর তার সাথে 'মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ', 'পুঁজিবাদ হো বরবাদ' বা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ইত্যাদি স্লোগান কিছু যুক্ত করে দিলেই তাদের অবস্থা পাল্‌টে যাবে না। যদি তাদের লড়াই শুধু 'এক্‌স্‌টেনসন অব ডেমোক্রেটিক রাইট্‌স্‌'-এর (গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের) জন্যই লড়াই হয়, তাহলে যত গণতান্ত্রিক অধিকারই অর্জিত হোক না কেন, মজুরদের 'ইমান্‌সিপেশন' (মুক্তি) কখনও হবে না। মুক্তি অর্জন করতে হলে শ্রমিকদের বুঝতে হবে যে, গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই সংগ্রামগুলো শুধু অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যূনতম অধিকারটুকু নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয় এবং একইসঙ্গে এটাও তাদের বুঝতে হবে যে, এইভাবেই দৈনন্দিন দাবি আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম গড়ে উঠছে, সেগুলি এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার মতো উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়। একমাত্র এই আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মজুরদের মধ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তির (সংগ্রাম কমিটিগুলির) জন্ম দিতে পারলেই পুঁজিবাদকে উপড়ে ফেলার মতো ' প্রোট্র্যাক্‌টেড্‌' (দীর্ঘস্থায়ী) 'ওয়ার' বা বিপ্লবী লড়াই শুরু করা সম্ভব — যে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই রাষ্ট্রশক্তির হাজার একটা দমনপীড়নের মুখেও ভেঙে পড়বে না। যেমন করে ভিয়েতনামের মানুষকে 'নাপাম' বোমা দিয়ে, গোটা দেশটাকে মরুভূমি বানিয়ে দিয়েও খতম করা গেল না। শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে মাথা হেঁট করে হটে আসতে হ'ল।

তাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্বন্ধে মার্কস প্রথম থেকেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে — শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করবে কেন? করবে এই কারণে যে, এটা হচ্ছে 'স্কুল অব কমিউনিজম' (সাম্যবাদী শিক্ষার বিদ্যাপীঠ), সাম্যবাদ সম্পর্কে জ্ঞানের হাতেখড়ি হয় এখানে। সকলে মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিদিনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে লড়তে গিয়ে, শ্রমিক ঘটনা বিশ্লেষণের, সত্যানুসন্ধানের সুযোগ পায়। সে বুঝতে থাকে কেন বিপ্লব ছাড়া মুক্তি নেই। যথার্থ বিপ্লবীরা ছাড়া আর কেউই প্রতিদিনের লড়াই-এর মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের এইভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চায় না। অন্যেরা, মেকি বিপ্লবীরা মজুরকে বলে — ইউনিয়ন কর, ইউনিয়ন চালাও আর তারা নিজেরা ইউনিয়নে 'ব্যুরোক্রেসি'র

জন্ম দেয়, মজুরকেও তাতে অভ্যস্ত করিয়ে নেয়। এইভাবে ট্রেড ইউনিয়নিজম্ একটি ব্যুরোক্রেসিতে (আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায়) পর্যবসিত হয়। নেতারা একটা ধারণা গড়ে তোলে যে, তারা সব মস্ত লোক। তাদের কথার দাম আছে। মালিকরা তাদের ভয় করে, খাতিরও করে। আপনারা মনে রাখবেন, এই 'খাতির' আর 'ভয়' হচ্ছে মাসতুতো-পিসতুতো ভাই। এসব নেতাদের দুটোই চাই। তারা মনে মনে চায় যে, মালিকরা তাদের খাতির করুক, সেইজন্য মালিকদের তারা ভয় দেখায়। মজুররাও সেইসব নেতাদেরই ধরে, যাদের ধরলে তারা মনে করে, তাদের কিছু পাইয়ে দিতে পারে। তাই দেখা যায়, যে পার্টিটা শাসন ক্ষমতায় থাকে সেই পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত ইউনিয়নের পাণ্ডাদের মজুররা গিয়ে ধরে, কারণ তারা মনে করে এদের ধরলে মালিকদের কানে জল ঢোকানো যাবে, তাদের কিছু দাবিদাওয়া আদায় করা সম্ভব হবে। এই যখন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা মজুরদের মুক্তি আন্দোলন এক পাও এগোয় না। এগোতে পারে না। এই ধরনের মজুর আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনের, মুক্তি আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই, তা তার ঝান্ডা লালই হোক, সবুজই হোক আর সাদাই হোক। যখন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কাজই হয় মজুরদের মধ্যে কেবল ক্ষোভ সৃষ্টি করা, বা যে দল নেতৃত্ব করছে তাদের পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে কেবল মজুরদের মধ্যে মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করা তখন বুঝতে হবে সেই দল বা নেতৃত্ব, ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি বা আমেরিকার বড় বড় ইউনিয়নের মতোই 'মডারেট ট্রেড ইউনিয়নিজম্' ও 'ইকনমিজম্' (অর্থনীতিবাদ)-এর চর্চা করছে। আপনারা দেখবেন আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের এইসব ট্রেড ইউনিয়নগুলো, কখনও কখনও কথায় কথায় গোটা দেশের কলকারখানায় ধর্মঘট করে, উৎপাদন বানচাল করে দেয়। এরা আদতে দেশের 'মনোপলি' (একচেটিয়া) গোষ্ঠীর মধ্যকার বিরোধী একটা অংশ। এদেরকে মনোপলিস্টরা (একচেটিয়া পুঁজিপতিরা) কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রিত) করে, যেমন ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই ধারক বাহক। তারা যখন ধর্মঘট করে গোটা ইংল্যান্ডকেই অচল করে দেয় তখন সেই ধর্মঘটের পিছনে সাধারণ মজুর উন্মত্তের মত দৌড়তে থাকে এবং ভাবতে থাকে যে, এইখানেই তারা বিপ্লবটা শুরু করেছে বোধহয়। অথচ এর দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ে না বরং ইউনিয়নের ধুরন্ধর নেতারা এই ধরণের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে মজুরদের বেঁধে ফেলেছে, আটকে ফেলেছে ভেবে মালিকরা, সাম্রাজ্যবাদীরা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে। ভাবে মজাটা ভালই হয়েছে। আর আটকে যাওয়া মজুর, বাঁধা গরুর মতো বুঝতেও পারে না যে নেতাদের শয়তানির

কৌশলে তারা বাঁধা পড়েছে। তাই মার্কস, লেনিন বার বার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে 'স্কুল অব কমিউনিজম' (সাম্যবাদী জ্ঞানলাভের বিদ্যাপীঠ) । বলেছেন যে, হাজার হাজার মজুর যারা ময়দানে, প্রাত্যহিক লড়ালড়িতে জড়ো হয়, অহেতুক গরম গরম কথা বলে শুধু হাততালি কুড়োবার আশায় তাদের খেপিও না। যে শত্রুকে জানো তার বিরুদ্ধে আগে-পিছে দশটা বিশেষণ লাগিয়ে বক্তৃতা দিয়ে সময় নষ্ট না করে কিছু কাজের কথা বল। একটা আন্দোলনের সফলতার সম্ভাবনা যদি থাকে তবুও তার যে বিফলতার দিকগুলো থাকতে পারে সেগুলি সম্পর্কে মজুরদের সচেতন কর। কোন একটা আন্দোলন বিফল হলেও কেন এটা বিফল হ'ল সেটা বোঝাবার সাথে সাথে এর মধ্যেও সফলতার যে দিকগুলো আছে সেগুলোও মজুরদের চেতনার স্তরে এনে দেবার কাজটাই হচ্ছে নেতাদের কাজ।

অথচ মজুর আন্দোলনে এসব বোঝানো হয় না। প্রতিদিনের এই সমস্ত আন্দোলনগুলিকে শেষ পর্যন্ত কোন্ রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং তারজন্য আন্দোলনগুলিকে কীভাবে পরিচালিত করতে হবে, এইসব মজুরদের বলা হয় না, শেখানো হয় না। মজুরদের কাছে শুধু গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া হয় — আপনারা মজবুত সংগঠন গড়ে তুলুন, বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হোন, দুর্গ গড়ে তুলুন — এমন দুর্গ গড়ে তুলুন যেখানে কেউ ঢুকতে না পারে। সঙ্গে সঙ্গে মজুররা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং দুর্গ তৈরি করে ফেলল — এমন দুর্গ যেখানে একটা লোক ভাল কথা বলতে এলেও যদি সে তার দলের বা সংগঠনের লোক না হয় তাহলে তাকে সেই কথা বলতেও দেওয়া হবে না।

আপনারা জানেন, অনেক লাল দুর্গ গোটা দেশে গড়ে উঠেছিল এমনভাবে যেন সেগুলো কোন বিশেষ দল বা সংগঠনের জমিদারি — সেখানে অন্য আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হত না। তা আমি বলি, কেউ ভাল কথা কিছু বললেও যেহেতু সে দলের লোক নয়, যেহেতু এটা আমাদের দুর্গ, সেহেতু তাকে ঢুকতে দেব না বা তার ভাল কথাতেও কান দেব না সেটা কেমন কথা? সমালোচনাটা হয়ত মুক্তি আন্দোলনেরই কাজে লাগতো, কিন্তু যেহেতু দুর্গ গড়া হয়েছে, সেই হেতু কানে তালা লাগানো কি কাজের কথা নাকি? নেতারা বলেছে বিভাগে বিভাগে দুর্গ গড়ে তোল — তার মানে কি এই যে, বুদ্ধিও যাতে নাক গলাতে না পারে! এর ফল কী হয়েছে? এর ফলে অন্ধতা বাড়ছে। অন্ধতার মনোবৃত্তি ফ্যাসিস্টসুলভ — তা বুর্জোয়াদের সাহায্য করে। শ্রমিক আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন অজ্ঞতার কারবার করে না। তারা যুক্তি, তর্কাতর্কি, আলাপ আলোচনা ও মতাদর্শগত সংঘর্ষে বিশ্বাস করে; কারণ তারা সত্যানুসন্ধানী। আলোচনা, যুক্তি,

তর্কাতর্কিতে তারা ভয় পায় না। আলোচনাকে চাপতে চায়, নিরুৎসাহিত করে তারাই যারা 'রং' (ভুল) জায়গায় আছে, যারা প্রতিক্রিয়াপন্থী। তাই তারা কখনও শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে, কখনও বা ঐক্যের দোহাই দিয়ে, দুর্গ-টুর্গ গড়তে হবে এসব কথা বলে আসলে তারা আলাপ আলোচনা চাপা দিতে চায়। তারা তর্ক-বিতর্কে ভয় পায়, যুক্তি বিশ্লেষণে ভয় পায়। তারা একটা মানুষকে বক্তৃতায় বিশ্লেষণ করতে দেখলে ঠাট্টা করে, বলে — ক্লাস নিচ্ছে। যেন শুধু খেপানোর জন্য বক্তৃতা করা দরকার। তারপর খেপে গিয়ে লোকে এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন লড়ালড়িতে মরুক। আর মরলে তো জনতাই মরে, নেতারা তো মরে না। এ সব নেতারা কে কবে কোথায় গুলি খেয়ে মরেছে? এরা মরে না। বিপ্লবীরা কখনও কখনও মরেন। কিন্তু এসব নেতাদের তো পুলিশ 'স্যার্' 'স্যার্' করে মাথায় তুলে রাখে, চারিদিক থেকে ঘিরে রাখে! তাই এই সব নেতারা শুধু লোক খেপায় আর লোক খেপে গিয়ে যত মরে তত বরং এসব নেতাদেরই সুবিধা! দুটো শহীদ দিবস করে শাসকদলকে গালাগালি দিয়ে নির্বাচন বৈতরণী পার হবার কড়ি কিছু জুটে যায় নেতাদের।

সঠিক রাজনৈতিক লাইনই হচ্ছে বিপ্লবের প্রধান শর্ত

আমি বলি বিপ্লবের জন্য মানুষকে তো মরতেই হবে। কিন্তু এত লড়াই, এত মৃত্যুবরণ সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হচ্ছে কী করে? তাহলে আসল কথাটা কী? আসল কথাটা হচ্ছে সঠিক রাস্তা, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও সঠিক রাজনীতি। যে দেশে লড়ছি সেই দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কী ধরনের, রাষ্ট্রকাঠামো কী প্রকৃতির সেটা ভাল করে বোঝা দরকার। এই সেদিনও চীনের পার্টি তাদের দশম কংগ্রেসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে সেটা আমার ভাল লেগেছে। এমন একটা পার্টি যে বিপ্লব ও তারপর সাংস্কৃতিক বিপ্লব করেছে, যে পার্টি একটা এতবড় দেশে হর্তা-কর্তা-বিধাতা, সে বলছে না যে, যেহেতু আমার এত সদস্য, এত জনসমর্থন বা যেহেতু এতগুলি কমিটির সমর্থন আমার পিছনে রয়েছে সেইহেতু আমি ঠিক। তারা কিন্তু বলছে — রাস্তা বা 'বেস পলিটিক্যাল লাইন' (মূল রাজনৈতিক লাইন) ঠিক না হলে, শক্তি বা জনসমর্থন যদি আজ থাকেও, আর্মি থাকলেও, সংগঠন থাকলেও, তা শেষ পর্যন্ত রাখা যাবে না। রাস্তা ভুল হলে আস্তে আস্তে সবই যাবে। একথার দ্বারা এটা ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে লাইন ভুল হলেও একটা সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না সাধারণ মানুষ তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধরতে পারছে ভুলটা কোথায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পিছনে জনসমর্থন থাকতে পারে। তা না হলে হিটলার একসময় জার্মানির

অবিসংবাদী নেতা হলেন কী করে? ডিক্টেটর নাসের এবং ইজিপ্টের কর্তারা নেতা হলেন কী করে বা কমিউনিস্টদের দমন করছে কী করে? লাইন 'ইন্‌কারেক্ট' (ভুল) হলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায় এবং একটা সময় পর্যন্ত তা ধরেও রাখা যায়। তার বড় প্রমাণ তো আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পর্যন্ত মুসলিম লীগের যে একচ্ছত্র আধিপত্য মুসলিম চাষী, মজুর, মধ্যবিত্তের উপর ছিল, তা থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু বেশিদিন কি এই সমর্থন ধরে রাখতে পারা গেছে? যায়নি। তাই চীনের পার্টি, এতবড় পার্টি, এত লোকজন, জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও বলেছে যে, রাস্তা ঠিক থাকলে একটি লোক নিয়ে যদি পার্টি শুরু হয় তাহলে সে এক থেকে দুই হবে, দুই থেকে পাঁচ হবে এবং এই ভাবে সে রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলবে ও ক্ষমতা দখল করবে। তাই রাস্তা ঠিক হওয়া একটা প্রধান শর্ত। মার্কস, লেনিন — সবাই একই কথা বলেছেন। বলেছেন, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। মার্কস বলেছেন যে, যারা সর্বহারা, তারাই একমাত্র এই দুনিয়াকে পাল্‌টাতে পারে। তিনিই প্রথম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে দুনিয়াকে পাল্‌টাবার বিজ্ঞানসম্মত পথের সন্ধান দিলেন। বললেন, মজুররা দুনিয়াকে পাল্‌টাতে পারে, কথাটার মানে এই নয় যে মজুর সর্বহারা বলেই সে পাল্‌টাতে পারবে। যেকোন রকমে হাজার হাজার প্রলেতারিয়েত সংগঠিত হয়ে বিপ্লবের নারা (ধ্বনি) লাগালেই পারে না। সেই প্রলেতারিয়েতই পারে যে নিজেকে পরিবর্তিত করে বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে।

বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির শিকার বা দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকের সংস্কৃতি, সর্বহারা সংস্কৃতি নয়

শুধু রাজনৈতিক ভাবে নয়, স্লোগানে নয় — আচার-আচরণে, নীতি-নৈতিকতায়, সংস্কৃতি-রুচিতে বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত করে নিজের মধ্যে বিপ্লবী নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে যে প্রলেতারিয়েত, সেই একমাত্র দুনিয়াকে পরিবর্তিত করতে পারে। বুর্জোয়া পরিবেশ থেকে অর্জিত বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ, ভাবধারা ও অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে মজুররা যতদিন না মুক্ত হয়, ততদিন আর্থিক দুর্গতি বাড়লেও সে বিপ্লব করতে পারে না। বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির যে রূপ আমরা মজুরদের মধ্যে দেখি, মজুর বলেই সে সংস্কৃতি প্রলেতারিয়েত সংস্কৃতি নয়। একসময় 'ফিলান্‌থ্রপিক আইডিয়া' থেকে কিছু লোক এসেছিল যারা মনে করত — মজুরের মধ্যে যা কিছু সবই বিপ্লবী। তাই মার্কস থেকে লেনিন সবাই তাদের কান মলে দিয়ে বলেছেন যে, 'প্রোলেটারিয়ান

* নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার পরিচালিত দল

কাল্‌চার' (সর্বহারা সংস্কৃতি) মানে 'কালচার ইট্‌সেল্‌ফ্‌ প্রোলেটারিয়েট' হবে না (সংস্কৃতিটা সর্বহারা হবে না)। প্রলেতারিয়ান কালচারের অর্থ এ নয় যে খোদ কালচারই প্রলেতারিয়েত! তাঁরা বলেছেন যে, বুর্জোয়া বিপ্লববাদের আধারে মানবতাবাদী মূল্যবোধ ও উদারতার কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল। শ্রমিক বিপ্লবের যুগে, শ্রমিক বিপ্লবের আদর্শকে কেন্দ্র করে, প্রলেতারিয়ান সংস্কৃতি অর্জন করার অর্থ — অজ্ঞ, অশিক্ষিত, বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত প্রলেতারিয়েতদের ভাষাগুলি, অভ্যাসগুলি রপ্ত করা নয়। বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের মধ্যে পর্যুদস্ত হয়ে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে, এই জীবনকেই সত্য বলে, নিয়ম বলে, মেনে চলছে যে মজুর, অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের গোলকধাঁধায় ফেঁসে আছে যে মজুর — তার থেকে মুক্ত করে অমিত তেজে তাকে খাড়া করে, নতুন আদর্শে বলীয়ান করে, তাকে কমিউনিস্ট করার জন্যই প্রলেতারিয়ান সংস্কৃতি। ভারতবর্ষে দেখছি সম্পূর্ণ উল্‌টো জিনিস। মজুরদের মধ্যে যেতে হবে এবং মিশতে হবে বলে তথাকথিত কমিউনিস্টদের নেশা-ভাঙ করতে, গাঁজা খেতে হয় এখানে। এক সময় বাড়িঘর ছেড়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে বিপ্লব করতে কত কর্মী এসেছিল লেবার পার্টিতে*। এত বড় একটা পার্টি, যে খোদ মজুরদের মধ্যে এত কর্মী পেয়েছিল, তা এত অধিক পরিমাণে আমরা কোন পার্টিই পাইনি, তার কী করুণ পরিণতিটাই আমরা দেখছি আজ! প্রলেতারিয়ান সংস্কৃতি শেখাতে গিয়ে খুব দুর্দশাগ্রস্ত প্রলেতারিয়েতে পর্যবসিত করে দিল তাদের সবাইকে। কোন কর্মীকে তারা বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তুলতে পারেনি। কত ক্যাডারের কী বিরাট সর্বনাশ করে দিল তারা। বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির শিকার যে নৈতিকতাহীন প্রলেতারিয়েত, তাদের জাগাতে গিয়ে নিজেরাই তার শিকার বনে গেল। তাদের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল শুধু এই চোরাবালির পথ বেয়ে। তাই মার্কসবাদী আন্দোলন বা মজুর আন্দোলনে জয়যুক্ত হওয়ার প্রধান শর্ত হচ্ছে যে, মজুর যদি নিজেকে পরিবর্তিত করতে না পারে তাহলে সে দুনিয়াকেও পরিবর্তিত করতে পারবে না। সেজন্য সর্বহারা সংস্কৃতির আধারে সঠিক রাজনৈতিক লাইনকে ভিত্তি করে যথার্থ বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি বিপ্লবের প্রশ্নটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মজুরের হাতে যেটি একমাত্র অস্ত্র বা বিজ্ঞান সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে মজুরকে শ্রেণীসংগ্রামের অন্তর্নিহিত নিয়ম ও রূপ, দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির যথাযথ বিশ্লেষণটি সঠিকভাবে বুঝতে হবে। অভাব, অনটন, অত্যাচার, জুলুমকে কেন্দ্র করে যে লড়াইগুলি সমাজ অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে, তাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন্‌ লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে সেকথা বুঝতে হবে — কে শোষণ করছে, কার বিরুদ্ধে লড়াই — এগুলো বোঝাই হচ্ছে

শ্রমিক আন্দোলনের মূল কথা। আপনারা লড়াই চান এবং এর জন্য সংগঠন চান। আর লড়াই ও সংগঠন হলেই খুশি হন। এরকম হলে চলবে না। লড়াই কেন? সংগঠন কেন? লড়াইয়ের জন্যই নিশ্চয়ই লড়াই নয়। সংগঠনের জন্যই নিশ্চয়ই সংগঠন নয়। তাহলে লড়াই বলুন সংগঠন বলুন এ সবগুলিই হচ্ছে বিপ্লবের জন্য, শ্রমিকদের মুক্তির জন্য। কার হাত থেকে মুক্তি? কে শোষণ করছে? বাধাটা কোথায়? রাম আমাকে শোষণ করছে আর আমি যদি শ্যামের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্রস্তুত হতে থাকি, তাহলে আমি কোনদিনই মুক্তি অর্জন করতে পারব না। তাই সঠিক রাস্তা নির্ণয় করতে পারাটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। সততা, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, সংগ্রামী মন এগুলি সব থাকলেও রাস্তা যদি ভুল হয় তাহলে তার দ্বারা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই হবে না। মনে রাখবেন এগুলি হচ্ছে 'এলিমেন্টারি বেস কোয়ালিটি' (প্রাথমিক মৌলগুণ) যা ব্যতিরেকে বিপ্লবীরা কেন প্রতিক্রিয়াশীলরাও কিছু করতে পারে না। ফ্যাসিস্ট নাৎসিরা যারা জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তি গড়ে তুলেছিল, বিপ্লবকে রুখেছিল, প্রতিবিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল — জাপানি সাম্রাজ্যবাদ যারা তাদের জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও জুলুম সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উপর চালু করেছিল, গত মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যারা এত বড় ধমকি তুলে ধরেছিল, তারা বুঝে হোক না বুঝে হোক একটি নৈতিক বল, সততা ও নিষ্ঠা নিয়েই কাজ করেছিল। তারা 'হারিকিরি' করত। হারিকিরি কথাটা শুনেছেন নিশ্চয়ই। এই জাপানি সাম্রাজ্যবাদের অনুচরেরা যখন মনে করত যে তারা রাষ্ট্রের সাথে, মিলিটারির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যে কর্তব্যটি তাদের করার কথা তা করতে পারেনি, তখন তারা নিজেরা নিজেদের শাস্তি দিত। এটা 'ডেডিকেশন' (নিষ্ঠা) ও 'ডিসিপ্লিন'-এর (শৃঙ্খলার) চিহ্ন। নাৎসিদের জীবনযাত্রার কথা পড়লে, তাদের শৃঙ্খলার কাহিনী পড়লে বুঝতে পারবেন যে এটা এক ধরনের শৃঙ্খলা, এক ধরনের 'মিলিট্যান্সি' (জঙ্গি মনোভাব) যা প্রতিক্রিয়াশীলদেরও দরকার। যারা কিছু করতে চায় তাদের প্রত্যেকেরই এটা দরকার। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে 'বেস পলিটিক্যাল লাইন' (মূল রাজনৈতিক লাইন) সঠিক কিনা, 'মেন পলিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ' (মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি) ঠিক কিনা। 'অনেস্টি' (সততা) আছে অথচ যে বস্তুটি আপনি গড়তে চাইছেন তার সম্পর্কে আপনার কোন সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণা নেই, তাহলে আপনি তো তা গড়তে পারবেন না। ধরুন টিঙ্কচার আয়োডিন তৈরি করতে যে 'ইন্‌গ্রেডিয়েন্টস্' (উপাদানগুলি) একত্রে মেলাতে হয় তা আপনি জানেন না। চুন, বালি আর সুরকি মিলিয়ে ঐ জিনিস তৈরি করতে গিয়ে আপনি কঠিন পরিশ্রম করতে পারেন, উপোস করতে পারেন, এমনকী জান দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। নিষ্ঠা ও সততার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি আপনার নেই বলেই

কি আপনি তা তৈরি করতে পারবেন? সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতার দরকার আছে বলে শুধু এই 'কোয়ালিটি'গুলোকে মূলধন করে কোনও মনগড়া ধারণা দিয়ে কি কেউ টিঙ্কচার আয়োডিন-টা তৈরি করতে পারেন? রাজনীতি-সমাজনীতিতেও একথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত জরুরি। আপনাদের বুঝতে হবে, ভারতবর্ষের এই বিপ্লবটা কোন্ ধরনের বিপ্লব? ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক শোষণের মূল কারণ কী, এর রাষ্ট্রের চরিত্র অর্থাৎ কোন্ কোন্ শ্রেণী এটি দখল করে আছে — এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ধারণাটা যতক্ষণ না পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ বিপ্লবের মূল রাস্তা, যাকে আমরা মূল রণনীতি ও রণকৌশল বলি, তা আমরা ঠিক করতে পারব না। এইখানে যদি মনগড়া ধারণার ওপর, ভুল সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে, বিপ্লবের জন্যও কেউ একটা দল গঠন করেন, তাহলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে কেন্দ্র করে লড়তে থাকলে তাঁরা হয়ত কিছুদিনের জন্য মানুষকে সংগঠিত করে একটি শক্তিশালী পার্টিও গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন, কিন্তু বিপ্লব করতে পারবেন না। বরং এর দ্বারা মানুষের মধ্যে লড়াই এর যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার মধ্য দিয়ে, বিপ্লবী শক্তি নিঃশেষিত হবে — ফলে এরই ফাঁকে পুঁজিপতি ও প্রতিক্রিয়াশীলরাই আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হবে। সেজন্য ভারতবর্ষের মূল সমস্যাগুলি কী এবং কেন তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে ভাল করে আমাদের বুঝতে হবে। আমার বিচারে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবন আলোড়িত হচ্ছে তিনটি মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে। সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, যে সম্পর্কে আমি এর আগে আলোচনা করেছি, তাকেও ভালভাবে বুঝতে হলে এই তিনটি মূল সমস্যাকে ভাল করে বুঝতে হবে।

ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে তিনটি মূল সমস্যা

আমাদের সমাজ জীবনের সমস্ত সমস্যা জড়িয়ে আছে যার সঙ্গে তার মধ্যে প্রধান যেটি, সেটি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা। কিছুতেই এই সমস্যা রোধ করা যাচ্ছে না। একটা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে আর বেকার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কেন এটা হচ্ছে? ওরা বলছে জনসংখ্যাবৃদ্ধিই এর মূল কারণ। একথা সত্য কি না, এটি যথার্থই মূল কারণ কি না, তা বিচার্য বিষয় হতে পারত যদি তার আগে তারা প্রমাণ করতে পারত যে, দেশে যে 'রিসোর্স' (সম্পদ) অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি ও শ্রমশক্তি রয়েছে তার 'ওয়েস্টেজ' (অপচয়) হচ্ছে না, 'করাপ্শন' (দুর্নীতি) নেই, 'ওয়েস্টফুল এক্সপেন্ডিচার' (অপব্যয়) নেই, 'ইন্স্টলড্ ক্যাপাসিটি আইড্ল্' নয় (উৎপাদিকা শক্তি অলস হয়ে বসে নেই), তার পুরো ব্যবহার হচ্ছে বা ব্যবহার করার প্রকৃত চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে কোন কার্পণ্য নেই।

তারপর অর্থাৎ এসব করেও যত লোককে কাজ দেওয়ার কথা তা দেওয়া যাচ্ছে না — কেবলমাত্র তখনই বাড়তি জনসংখ্যা একটা সমস্যা হিসাবে বিচার্য বিষয় হতে পারতো। কিন্তু আমরা দেখছি উল্‌টো জিনিস।

এখানে যে উৎপাদিকা শক্তি রয়েছে তারই পুরো ব্যবহার হচ্ছে না। দুর্নীতি ও অপব্যয় প্রতিদিন বেড়ে চলেছে, সীমা অতিক্রম করছে। তাহলে কী দেখা যাচ্ছে? বাড়তি জনসংখ্যার জন্যই কি উৎপাদিকা শক্তিকে পুরো কাজে লাগানো যাচ্ছে না? দুর্নীতি ও অপব্যয়কে বন্ধ করা যাচ্ছে না? তাহলে এটা তো ধোঁকা দেওয়ার কথা। আর এই ধোঁকাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য 'টেক্‌নোক্র্যাট'-দের (বিশেষজ্ঞ) পিছনে, কমিশন-কনফারেন্সের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। এখন দেশটা হয়েছে 'টেকনোক্র্যাট' নামক একদল মূর্খের স্বর্গরাজ্য। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ মানে পণ্ডিত নয়, বিশেষ ভাবে অজ্ঞ — মহামূর্খ। না হলে 'ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি' — তারা এরকম ব্যাখ্যা দিতে পারত না। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা একটা সমস্যাই নয় একথা আমি বলতে চাইছি না। আমি যেটা বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, শাসক ও শোষকশ্রেণী উল্‌টোপাল্‌টা বা নানা কথার চাতুরিতে বেকার সমস্যার সঙ্গে জড়িত যে প্রশ্নগুলি তাকে চাপা দিতে চাইছে। বাড়তি জনসংখ্যার দোহাই দিয়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। মূল জিনিসটিকে 'সাইড ট্র্যাক' করছে (পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে)।

তাহলে বেকারদের চাকরি দেওয়া যাচ্ছে না কেন? নতুন নতুন শিল্প, কলকারখানা গড়ে তোলার ভিত্তিতেই তো একমাত্র বেকারদের কাজ দেওয়া যায়। বসিয়ে বসিয়ে 'টপ-হেভি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (মাথাভারী প্রশাসন) করে কত লোককে কাজ দেওয়া যায়? তার একটা সীমা আছে ও তার কুফলও আছে। একটা 'ইন্‌ফ্লেটেড আর্মি' (স্ফীতকায় সৈন্যবাহিনী), 'ইনফ্লেটেড পুলিশ' (স্ফীতকায় পুলিশবাহিনী) বসে বসে খাচ্ছে। তার কুফল সমাজজীবনে বর্তাতে বাধ্য। এর ফলে 'প্যারাসাইটিজম্' (পরগাছাবৃত্তি) আমাদের 'অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকটিভিটি'-তে (প্রশাসনিক কাজকর্মে), সমস্ত 'ফিল্ড্ অব অ্যাক্‌টিভিটি'-তে (সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে) 'প্রিভেল' (বিরাজ) করবে। কিন্তু সেটা অন্য কথা। 'ন্যাশানাল ওয়েস্টেজ'-এর (জাতীয় সম্পদের অপচয়ের) কথাও না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু কত লোককেই বা এভাবে কাজ দেওয়া সম্ভব? আর একটা নতুন 'এমপ্লয়মেন্ট অ্যাভেনিউ' (চাকরি দেওয়ার রাস্তা) আজকাল হয়েছে। সেটা হচ্ছে সেবাদল বা 'ভলান্টিয়ার' বাহিনী গঠন। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরাই এক একটা 'এন্টারপ্রেনিওর' বা 'বিজনেস

কন্‌সার্ন' (ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) হয়ে দাঁড়িয়েছে — যেখানে কর্মখালি আছে, চাকরি দেওয়া যায়। অর্থাৎ পার্টির হয়ে লাঠি ধরলে, ভলান্টিয়ারি করলে, নির্বাচনে কাজ করলে, তার বিনিময়ে ৫ টাকা ১০ টাকা রোজ পাবেন। এটা এদেশে শুরু হয়েছে। একটা বিরাট সংখ্যক 'আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ'-কে (বেকার যুবকদের) এইভাবে কাজ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, যা দুনিয়ার আর কেউ কোনদিন শোনেনি। তৃতীয়ত, এদেশে বড় বড় জোতদার, মহাজন, রাঘববোয়াল, কালোবাজারি, পাইকাররা আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের একটা বিরাট সংখ্যাকে চাল পাচারের কাজে নিযুক্ত করেছে। এই 'ব্ল্যাক মার্কেটিং'-এর (কালোবাজার) মতো একটা 'আনএথিক্যাল মিন্‌স্ অব লাইভ্‌লিহুড' (দুর্নীতিপূর্ণ জীবনযাপনের পথ) এদেশে একটা 'ওপেন থিং' (প্রকাশ্য বিষয়) হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোলাখুলি ভূয়া রেশনকার্ডের ভিত্তিতে রেশনের চাল, চিনি প্রভৃতি বিক্রি হচ্ছে অন্যত্র বেশি দামে। একটা দেশের সরকার বসে বসে সব কিছু দেখছে, লজ্জা নেই। তাহলে সেদেশে কোন 'মরাল স্ট্যান্ডার্ড' (নৈতিক মান) থাকে না কি? সকলেই তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যাই হোক, এইভাবে নানান পথে মানুষের কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা, বেকার সমস্যার চাপ যা প্রতিদিনই বাড়ছে তাকে কমাতে পারে না কি? একমাত্র শিল্পবিকাশের পথ খুলে দিতে পারলেই এর সুষ্ঠু মীমাংসা সম্ভব। আর শিল্পবিকাশের পথ উন্মুক্ত হওয়ার সাথে যুক্ত হয়ে আছে গ্রামীণ অর্থনীতির 'মডার্নাইজেশন অ্যান্ড মেকানাইজেশন', আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণের প্রশ্নটি। কৃষি অর্থনীতির আধুনিকীকরণ না হলে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ জন মানুষ যারা গ্রামে বাস করে, তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা সম্ভব নয়। আর কৃষি অর্থনীতির আধুনিকীকরণ সম্ভবই নয় যদি শিল্পের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা না যায়। কারণ শিল্পের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে, কৃষির আধুনিকীকরণের ফলে গ্রামে যে বাড়তি লক্ষ লক্ষ বেকার হবে তাদের কাজ দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু শহরে কলকারখানায় এমনিই যেখানে লালবাতি জ্বলছে সেখানে বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে। যে কারখানাগুলি চলছিল সেগুলি যেখানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেখানে কৃষির আধুনিকীকরণ হবে কী করে? আর কৃষির আধুনিকীকরণ না হলে গ্রামের অবস্থার উন্নতি হবে না, বাজারে 'পারচেজিং ক্যাপাসিটি' (ক্রয়ক্ষমতা) বাড়বেনা অর্থাৎ 'এক্সটেনশন অব মার্কেট' (বাজারের সম্প্রসারণ) হবে না। আর বাজার সম্প্রসারণ না হলে উৎপাদনের 'আর্জ' (তাগিদ) আসবে কোত্থেকে? এটা একটা 'ভিসিয়াস্ সার্কেল'-এর (বিষচক্র) মত দাঁড়িয়ে আছে। তা হলে এই প্রশ্নগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে কী?

উৎপাদনের অগ্রগতিতে আমাদের দেশে বাধার সৃষ্টি করছে কে?

'ইন্‌ভেস্টমেন্ট অব ক্যাপিটাল'-এর (পুঁজি লগ্নি করা) 'প্রবলেম'-টা (সমস্যা) কী? এটা পরিষ্কার যে, পুঁজির সমস্যাটি মূল সমস্যা নয়। মূল কারণ হচ্ছে — বাজার নেই। তাহলে বাজারের সমস্যা কার? পুঁজিবাদের না সামন্ততন্ত্রের? এটাই হচ্ছে 'ক্রাক্‌স্‌ অব দি প্রবলেম' (সমস্যার মূল)। সামন্ততন্ত্র কতটা আছে বা না আছে এই তর্কের মধ্যে আমি যেতে চাই না। আমার কাছে এটা 'মোস্ট ইর্‌রিলেভেন্ট কোয়েশ্চেন' (অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন)। প্রথমত আমাদের দেশে 'ল্যান্ড রিলেশনে'র (ভূমি সম্পর্কের) ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র নেই। সময় থাকলে তা আরও বিশদ ব্যাখ্যায় যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করে দিতাম। কিন্তু তর্কের খাতিরে না হয় ধরাই গেল যে সামন্ততন্ত্র কোথাও কোথাও ভূমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখনও বর্তমান। মার্কসবাদ বলছে — 'মিক্সড ফেনোমেনন' (মিশ্র ঘটনা) বিচারের ক্ষেত্রে সেই 'ফেনোমেনন'-এর মূল বা 'ডমিন্যান্ট ক্যারাক্‌টারিস্টিক' কোন্‌টা, তা দিয়েই ফেনোমেনন-টির চরিত্র বিচার করতে হয়। এখন দেখা যাক ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য কী? পুঁজিবাদ না সামন্ততন্ত্র? ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূল ধাঁচাটা সামন্ততান্ত্রিক না পুঁজিবাদী?

কৃষি অর্থনীতি সমেত ভারতবর্ষের গোটা অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজির নিয়ম চালু রয়েছে

তাহলে কথা হ'ল, এই যে ইস্পাত উৎপাদন এদেশে ব্যাহত হচ্ছে — এটা করছে কারা, সামন্তীরা? না কি এটা হচ্ছে পুঁজিবাদী বাজার সঙ্কটের জন্যই? এখানে যে 'প্রোডাক্‌টিভ ক্যাপাসিটি আইড্‌ল্‌' (উৎপাদিকা শক্তি অলস) হয়ে বসে আছে এর কারণ কি পুঁজিবাদী বাজার সঙ্কট নয়? সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক আজ অকার্যকরী হয়ে গেছে। 'স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌' (পরিসংখ্যান) দিয়ে যদি কেউ দেখানও যে কিছু লোকের হাতে এখানে জমি আছে যাদেরকে কেউ কেউ আবার বলছেন 'ক্যাপিটালিস্ট ল্যান্ডলর্ড্‌স্‌' (পুঁজিবাদী বৃহৎ জোতের মালিক) তাহলেও এটা প্রমাণ হয় না যে, সামন্ততন্ত্র বা আধা সামন্ততন্ত্র গ্রামীণ অর্থনীতিতে 'ডমিন্যান্ট প্রোডাকশন রিলেশন' (মূল উৎপাদন সম্পর্ক) হিসাবে বিরাজ করছে। কৃষি অর্থনীতিতে 'ক্যাপিটালিস্ট ল্যান্ডলর্ডিজম্‌' বলে একটা কথা আছে ঠিকই। ইংল্যান্ডে আছে। একটা সময় আমেরিকাতেও কিছুকাল ধরে কতকগুলো অঞ্চলে তা গড়ে উঠেছিল। তাদের যে ক্যাপিটালিস্ট ল্যান্ডলর্ড বলা হত সেটা তো পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেটা তো পুঁজিবাদের সঙ্গে সামন্তী অভ্যাসের খাদ হয়ে মিশে যাওয়ার ব্যাপার। পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পথেই তার অবলুপ্তি। পুঁজিবাদকে রেখে তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে এই সামন্তী

অভ্যাসকে উচ্ছেদের কোন জায়গাই সেখানে তো নেই। কিন্তু এখানে এইসব নানা আগড়ুম বাগড়ুম কথা তুলে বিপ্লবের আসল প্রশ্নটিকে গোলমাল করে দেওয়া হচ্ছে।

রাষ্ট্র এখানে পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে, বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। রাষ্ট্র-উচ্ছেদের লড়াই-ই হচ্ছে বিপ্লব। মজুররা যে লড়বেন, সংগঠন করবেন — তা তো শেষ পর্যন্ত এই শোষণমূলক রাষ্ট্রকেই উচ্ছেদ করার জন্য। এর মানে হ'ল একটা শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য করবেন, একটা অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থাকে আঘাত করে সরিয়ে দেবেন। কিন্তু এই যে শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হবে, সেটা কোন্ শ্রেণী? আঘাত করবেন কোন্ শ্রেণীর অর্থনীতিকে, কোন্ ব্যবস্থাকে? পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা না অন্য কিছু? অথচ এই মূল বিষয়টি গুলিয়ে দেবার জন্য অনেকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তী ব্যবস্থার সাথে সাথে একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও স্লোগান তুলছেন। একচেটে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তো সবাই এমনকী ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেসও স্লোগান দিচ্ছে। সি পি আই-সি পি আই (এম) তারাও এই একই সুরে স্লোগান দিচ্ছে। সকলের ধাপ্পা এক। একচেটে পুঁজি বা কোন একজন ব্যক্তিগত মনোপলিস্ট যেমন টাটা বা বিড়লার বিরুদ্ধে লড়াইটা কি ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই, নাকি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই? তাই স্লোগানটা শ্রেণীর বিরুদ্ধে হওয়া দরকার। একচেটে পুঁজিপতি একটা আলাদা কোন শ্রেণী নয়। তারা একটা গোষ্ঠী। 'ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি' (ধনকুবের গোষ্ঠী) বা 'ফিনান্স ক্যাপিটাল'-এর (লগ্নিপুঁজির) অধিকারী হল ব্যাঙ্কিং ও শিল্পগুলির মালিক গোষ্ঠী। আমরা যে বুর্জোয়াশ্রেণীকে আঘাত করতে চাই সেই শ্রেণীর নেতা হচ্ছে এই গোষ্ঠীটা। কিন্তু নেতাকে সামনে রেখে শ্রেণীকে লক্ষ্য না করার মানে যে পুঁজিবাদ আমার মূল শত্রু তাকেই আড়াল করা। তাহলে বুর্জোয়াশ্রেণীকে আড়াল করে কি আমরা বুর্জোয়াশ্রেণীকে হটাতে পারি? দেখবেন মার্কস, এঙ্গেলস এবং সেদিনও চীনের পার্টির দশম কংগ্রেসে চৌ-এন-লাইও নানা ভাষায় এই কথাটাই বলেছেন যে, আমাদের লড়াই কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। ব্যক্তি চলে গেলেও শ্রেণী যতক্ষণ থাকবে, মনোপলি (একচেটিয়া পুঁজি) আবার জন্ম নেবে। মনোপলি মানে বিড়লা নয়। মনোপলি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার, বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনের, একটি অনিবার্য ফল। তাই পুঁজিবাদ যতক্ষণ থাকছে, ততক্ষণ বিড়লা গেলে তস্য বিড়লার সৃষ্টি হবে। সেজন্য টাটার বিরুদ্ধে, বিড়লার বিরুদ্ধে বা একজন কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে যখন লড়াই হয় তখন সেটা যদি পুঁজিবাদ উচ্ছেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিচালিত না হয় — জনতাকে, শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া

শ্রেণীশাসনের উচ্ছেদের পরিপূরক বিপ্লবী চেতনা ও আদর্শে সংগঠিত করা না হয় তাহলে লড়াইয়ের মধ্যে যতই বিপ্লবী বুক্‌নি থাকুক না কেন তা আসলে পুঁজিবাদকে কোথাও আঘাত করে না, বিন্দুমাত্র আঘাত করে না।

ভারতবর্ষের বিপ্লব পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

তাহলে দেখা যাচ্ছে এইসব মেকি বিপ্লবী দলগুলির তথাকথিত একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী স্লোগানের অর্থ হ'ল এদেশের 'অ্যান্টি-ক্যাপিটালিস্ট রেভোলিউশন'-কে (পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবকে) আড়াল করবার জন্য, পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য টাটাকে বা বিড়লাকে 'স্কেপগোট' করা ছাড়া আর কিছু নয়। বিপ্লবকে বোঝার জন্য তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সহজ কথাগুলোকে এভাবে এদেশে গোলমাল করে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে রাষ্ট্র বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে সেখানে বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের বিপ্লবকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পরিভাষায় বলা হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। রাষ্ট্র ক্ষমতায় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে দু'দশটা সামন্তী থাকলে, তার দ্বারা বিপ্লবের স্তর পাল্‌টে যায় না। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে দেখতে পাবেন, ফেব্রুয়ারিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর যে কেরেন্‌স্কি সরকার গঠিত হয় তাতে মন্ত্রীসভায় প্রতিরক্ষা, অর্থ, পররাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি সবই 'জার' পরিবারের লোকদের দখলে ছিল। তা সত্ত্বেও 'এপ্রিল থিসিসে' লেনিন বলছেন যে, যে মুহূর্তে নিকোলাই জারকে হটিয়ে রাষ্ট্রশক্তি বুর্জোয়ার হাতে চলে গিয়েছে সেই মুহূর্ত থেকেই রাশিয়ার বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে প্রবেশ করেছে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে রাজনৈতিক দিক থেকে।

লেনিন কি জানতেন না যে তখনও কুলাকরা, কুলাকিজম রয়েছে? জারের প্রভাব রয়েছে? সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচুর পুঁজি খাটছে এবং অর্থনীতিতে তখনও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব পুরোমাত্রায় বর্তমান রয়েছে? একদল মার্কসবাদী সেখানেও ছিল, যারা এই সমস্ত উল্লেখ করে চিৎকার করেছে যে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের পুরো উচ্ছেদ না করে, একলাফে কী করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে! লেনিন আচ্ছা করে তাদের কান মলে দিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন — মার্কসবাদ 'ইকনমিক ডিটারমিনিজম' (অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ) নয়। বলেছিলেন ঃ 'পলিটিক্স মাস্ট টেক প্রিসিডেন্স ওভার ইকনমিক্‌স্ অ্যান্ড টু আর্গু আদারওয়াইজ ইস টু ফরগেট এবিসি অব মার্কসইজম' (রাজনীতি অর্থনীতির আগে; বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখার অর্থ হ'ল মার্কসবাদের অ আ ক খ ভুলে যাওয়া)। রাজনীতি এবং অর্থনীতির মধ্যে যে পারস্পরিক

সম্পর্ক, সেটা এ রকম যান্ত্রিক নয় যে, রাজনীতি শুধু অর্থনীতিকে অনুসরণ করে গড়ে উঠে। যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের প্রভাব থাকা সত্বেও, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় সামনে এসে গেল। শুধু এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে লেনিন বললেন — অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলি সাধিত হওয়ার আগেই যেহেতু বুর্জোয়ারা আজ রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে গেছে, তাই তাকে না হটিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে আজ আর একচুলও হটানো সম্ভব নয়। 'ইন্ দ্যাট রেসপেক্ট্ অ্যান্ড টু দ্যাট এক্সটেন্ট' সেই অর্থে এবং ততটুকু পরিমাণে রাশিয়ার বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং যতদিন না বিপ্লব সমাধা হচ্ছে ততদিন এ দুটো জিনিস খাদ হয়ে পাশাপাশি চলবে।

অথচ আমাদের দেশে একদল তথাকথিত মার্কসবাদী মার্কস-লেনিনের কাছ থেকে কোন শিক্ষাই না নিয়ে, রাষ্ট্রটি যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র এবং বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেটাই যে মূল প্রশ্ন তা একেবারে খেয়াল না করে এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব আছে বলে চিৎকার করছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে — গ্রামে এখনও মান্ধাতা আমলের সেই চাষবাসের পদ্ধতি, টুকরো টুকরো করে ছোট ছোট প্লটে জমি চাষ হয়, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বেশিরভাগ জমি আছে। বৃহদাকার কৃষি-খামার ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি বা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যা দেখতে পাওয়া যায় তা এখানে অনুপস্থিত ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সম্পর্কে লেনিনের একটি কথা আছে। তিনি আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। 'অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্ম' সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন যে, খণ্ড খণ্ড জমিতে মান্ধাতা আমলের পদ্ধতিতে চাষ অথবা আধুনিক পদ্ধতিতে বৃহদাকার কৃষি-খামার, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ইত্যাদি কোনটাই কৃষি অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী বা সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র নির্ধারণ করে না। উৎপাদন সম্পর্ক ও কৃষিতে উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিটা কোন্ ধরনের, তা দিয়ে বিচার হয় কৃষি অর্থনীতির সত্যিকারের চরিত্র।

অর্থাৎ কৃষিতে যে উৎপাদন হয় তার পণ্যের চরিত্র কী? তার ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিটা কী? সেটা কি 'লোকালাইজ্ড্ এগ্রিকালচারাল মার্কেট'-এর (স্থানীয় কৃষি বাজারের) পণ্য? না কি পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের 'ট্রেড অ্যান্ড কমার্সে'র (ব্যবসা-বাণিজ্যের) পণ্য? নাকি 'সোস্যালিস্ট ইকনমিক প্ল্যানিং'-এ (সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়) 'সোস্যালি নেসেসারি থিংস'-এর (সামাজিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর) 'এক্সচেঞ্জ' (বিনিময়) হওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট 'বার্টার' (সমমূল্যে বিনিময়) যেমন করে থাকে, তেমনি করে একে

কাজে লাগাচ্ছে এবং বাজারের মারফত আসছে, জনগণের মধ্যে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে 'কমোডিটি সার্কুলেশন' (বাজার মারফত পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা) কমিয়ে আনার উদ্দেশ্য প্রভৃতিকে সামনে রেখে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে? কোন্ উদ্দেশ্যে উৎপাদন হচ্ছে এবং উৎপাদিত পণ্য নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যই বা কী রীতিতে চলছে তার ভিত্তিতেই কৃষি অর্থনীতির চরিত্র নির্ধারিত হয়।

আমাদের এখানে কী হচ্ছে? এখানে জমির মালিক যারা তারা জমিতে পুঁজি খাটাচ্ছে এবং উদ্বৃত্ত পণ্য বাজারে বিক্রি করে তার থেকে মুনাফা করছে। মূলত ভোগের জন্য এখানে উৎপাদন হচ্ছে না। উৎপাদনের উদ্দেশ্য এখানে বাজারে বিক্রি করে সর্বোচ্চ লাভ করা। ফলে জমিও 'ক্যাপিটাল' বা পুঁজিতে, 'ক্যাপিটালিস্ট মিন্স্ অব প্রোডাকশন' — পুঁজিবাদী উৎপাদনযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। কৃষিতে উৎপাদন হয়ে, বাজারে বিক্রি হয়ে পুঁজিটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ M-C-M′ (টাকা বা পুঁজি-পণ্য-অধিক টাকা বা পুঁজি), এই অর্থনৈতিক নিয়ম পুরোপুরি চালু হয়ে গেছে কৃষি অর্থনীতিতে। জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। এ হ'ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম — অত্যন্ত সহজ এবং স্পষ্টভাবেই তাই।

তাই এখানে টুকরো টুকরো জমিতে চাষ হচ্ছে কি না, মেসিন, ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ হচ্ছে কি না এসব অবান্তর কথা। ট্র্যাক্টর বা উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার কেন এদেশে হচ্ছে না, সে বিষয়ে আলোচনা আমি এর আগে বহুবার করেছি। জাপানেও তো খণ্ড খণ্ড জমিতে চাষ হয়। 'বিগ ল্যান্ড ফার্মিং' (বৃহৎ খামার) নেই। তার দ্বারা কি প্রমাণ হয় জাপান পুঁজিবাদী দেশ নয়? এ দেশে বুর্জোয়ারা দেখছে যে, ট্র্যাক্টর, মেসিন ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করলে এক ধাক্কায় লক্ষ লক্ষ লোক কৃষি থেকে উৎখাত হয়ে বেকার হয়ে যাবে। শহরে কলকারখানার অবাধ বিকাশ ঘটিয়ে এদের যদি কাজ না দেওয়া যায়, তাহলে পুঁজিবাদ এমনিতেই যে শহরের ক্রমবর্ধমান বেকারের চাপে ধুঁকছে সে তো আরও লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ বেকারের চাপে মুখে থুবড়ে পড়বে।

দুনিয়াজোড়া অবাধ বাজারের সুবিধাকে সামনে রেখে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ যেভাবে তার শিল্প বিকাশের স্বার্থে গ্রামীণ জনসংখ্যাকে শিল্পে নিয়োগ করার তাগিদে, কৃষিতে ট্র্যাক্টর, মেসিনের প্রবর্তন করে কৃষি থেকে বাড়তি জনসংখ্যাকে মুক্ত করেছে, আজ বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী বাজারের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব যেখানে লুপ্ত, সেই চূড়ান্ত বাজার সঙ্কটে জর্জরিত, বিপ্লবভীত ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ, যে কিনা কলকারখানার মজুত উৎপাদিকা শক্তিকে পর্যন্ত পুরো কাজে লাগাতে অক্ষম হয়ে অলস করে রাখছে, অপচয় করছে সে কীভাবে কৃষির

আধুনিকীকরণ করতে পারে? কৃষির আমূল সংস্কারে হাত দিতে ভয় পেয়ে সে বরং উল্‌টো রাস্তা ধরেছে। বেশিরভাগ মানুষকে অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন করে ছোট-ছোট, টুক্‌রো টুক্‌রো জমিতে আটকে রাখছে এবং 'সবুজ বিপ্লবে'র ধোঁকাবাজিতে মানুষকে ভোলাচ্ছে। এ হ'ল সঙ্কটের মুখে পড়ে বুর্জোয়াদের শয়তানি পরিকল্পনা। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপারটা হ'ল — সি পি আই, সি পি আই (এম) যারা কৃষি বিপ্লবের কথা বলছে, সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের কথা বলছে তাদেরও কৃষি সম্পর্কিত পরিকল্পনা মূলত একই। মেসিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তন, কৃষির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে তাদের স্ববিরোধিতাটি লক্ষ্য করুন।

সি পি আই (এম) তার মজঃফরপুর দলিলে বলছে যে, ট্র্যাক্টর প্রবর্তন করলে তারা তার বিরোধিতা করবে, আন্দোলন গড়ে তুলবে। কেন? চাষী-মজুর নীতিগতভাবে ট্র্যাক্টর-মেসিন প্রবর্তনের বিরোধী নাকি? মেসিন-ট্র্যাক্টর তাদের শত্রু নাকি? হ্যাঁ, পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু থাকলে, মেসিন-ট্র্যাক্টর এলে বেকার সৃষ্টি করবে, অনেক মানুষের কাজ চলে যাবে — যেহেতু এখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। কিন্তু এই মেসিন-ট্র্যাক্টর সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তো বেকার সৃষ্টি করে না বরং গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা তাতে উন্নত হয়, আধুনিক হয়।

তাই স্লোগান হওয়া উচিত — "গ্রামের উন্নতির জন্য মেসিন-ট্র্যাক্টর আসুক — আমরা চাই। কিন্তু যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আমাদের বিকল্প কাজের সংস্থান করা হচ্ছে না, সেজন্য বিকল্প কাজ না দিয়ে ট্র্যাক্টর চালু করা চলবে না।" মজুর চাষীকে তাই বুঝতে হবে যে, পুঁজিবাদকে দ্রুত উৎখাত করার অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারলে মেসিন-ট্র্যাক্টর চালু করার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের 'পারচেজিং পাওয়ার' (ক্রয় ক্ষমতা) না বাড়িয়ে, 'কন্ডিশন অব লিভিং'-কে (জীবনমান) না বাড়িয়ে, বিজলী বাতির আলো না এলে গ্রামের চেহারা পাল্‌টানো যাবে না। গ্রামগুলির বর্তমান পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটানো যাবে না। উন্নতি ঘটবে না গ্রামীণ জীবনে। আর এইসব তথাকথিত কমিউনিস্টরা ট্র্যাক্টর-মেসিন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে অর্থাৎ পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে মেসিন-ট্র্যাক্টর চালু করতে গেলে যে বিপুল বেকারবাহিনী সৃষ্টি হতে বাধ্য সেই বেকারিবিরোধী আন্দোলনকে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনে 'ট্র্যান্সফর্ম' (রূপান্তরিত) করার পরিবর্তে বলছেন সামন্ততন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে। এর সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সম্পর্ক কী? সবই তো পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। বরং আমরা তো জানি যে, পুঁজিবাদী বিকাশের যুগে যখন পশ্চিমের দেশগুলোতে কৃষি অর্থনীতিতে কিছু কিছু মেসিন-ট্র্যাক্টর চালু হয়েছে তা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে

উৎখাত করতেই সাহায্য করেছে। তাহলে মেসিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সামন্তীবিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? অথচ কী অদ্ভুত যুক্তি এরা করে চলেছে!

কংগ্রেস দলের ভূমি সংস্কারের নীতি বা প্রোগ্রামের সঙ্গে তাই এইসব তথাকথিত কমিউনিস্ট ও বিরোধী দলগুলির কোনও তফাৎই নেই। সি পি আই, সি পি আই (এম) প্রভৃতি দলগুলির জমি বিলি করার মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্র বিরোধী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের কার্যক্রমটি কংগ্রেসেরই অনুরূপ। 'সিলিং' এর ঊর্ধ্বে যে জমি আছে তা কংগ্রেসের ঘোষণা অনুযায়ী ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার কথা — এমনকী সিলিং কমিয়ে পাঁচ একর পর্যন্ত করার কথা তো কংগ্রেসি মন্ত্রী এই সেদিনও বললেন। তাহলে তো বলতে হয়, উনি সবচেয়ে বড় বিপ্লবী; কারণ এর দ্বারা তো আরও বেশি জমি বিলি করা যাবে। এ সবই 'ইউটোপিয়া' (কল্পনা)। কেননা, সিলিং এর ঊর্ধ্বে যে জমি আছে তা সব নিয়েও যদি সারা দেশের ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা যায় তবে একজন চাষী হিসাবমতো দু'তিন বিঘার বেশি জমি পেতে পারে না। এই জমি তার ও পরিবারের ভরণপোষণের অর্থে কিছুই নয় — 'আন-ইকনমিক হোল্ডিং' (অলাভজনক জোত)। তাছাড়া সে জমিও হাল-বলদ, খরচের টাকার অভাবে সে চাষও করতে পারবে না। ফলে এর আবার একটা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হবে উৎপাদনের উপর। খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হবে। অভাবের দরুন জমি শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাহলে এইসব প্রোগ্রাম কার্যকরী কোন সমাধানই নয়। এগুলো 'স্টান্টে'র রাজনীতি হতে পারে।

জমি বিলি একটা মস্ত বড় সমস্যা। উদ্বৃত্ত জমি আন্দোলনের চাপে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা — গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ — এসবই জানা আছে। কিন্তু এর দ্বারাই বেকার সমস্যার সমাধান হবে, অবাধ শিল্প বিকাশের রাস্তা খুলবে, বাজার সম্প্রসারিত হবে এসব ধারণা তারাই পোষণ করে, তারাই জনতার মধ্যে এ ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ায়, যারা জেনে হোক না জেনে হোক যে পুঁজিবাদ আজ জনজীবনের প্রতিটি সমস্যা ও সমস্ত প্রকারের দুর্গতির জন্য দায়ী তাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে।

এদের স্ববিরোধিতা কী অদ্ভুত দেখুন! এরাই আবার বলছেন যে, গ্রামে খেতমজুরের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে, জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে, পুরনো অর্থনীতির সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে। বলছেন — 'ক্যাপিটালিজম হ্যাজ মেড্ এ ডিসিসিভ্ ইন্‌রোড ইন্টু এগ্রিকালচার' (কৃষিতে পুঁজিবাদ চূড়ান্তভাবে অনুপ্রবেশ

করেছে)। তা, পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ যদি কৃষিতে ঘটেই থাকে তাহলে সামন্ততন্ত্রটা গ্রামেই বা বিপ্লবের প্রধান শত্রু থাকে কী করে? তখন আবার নতুন করে ব্যাখ্যা হচ্ছে যে — না, না, সামন্তবাদ একটা পুরনো অর্থনৈতিক সম্পর্ক সেটি তো ভাঙছেই — কিন্তু ভাঙলে কী হবে — সামন্তপ্রভুরা এখন ধনী চাষীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে শোষণ করছে।

তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শ' শ' বিঘার মালিক হয়ে কেউ যদি গ্রামে থেকে চাষবাসে অংশগ্রহণ করে তাহলে সে জমিদার নয় — সে হবে ধনী চাষী, সে তখন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্র। আর জমিদার কারা? যাদের যে পরিমাণ জমিই থাকুক না কেন, গ্রামে থেকে যদি তারা চাষবাসে অংশগ্রহণ না করে — তাহলে তারাই জমিদার! ধরুন, শহরের একজন লোক যার গ্রামে পনের বিঘা জমি আছে অথচ নিজে চাষবাস করে না, সে হোল জমিদার। আর এই লোকটার থেকে কয়েকগুণ বেশি জমির মালিক হয়েও গ্রামে থেকে চাষবাস করে বলে, আর একজন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে ধনীচাষী, ওঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্রশক্তি। কারণ এরা না থাকলে গ্রামে তাদের চাষী সংগঠন হবে না। এরা যদি সঙ্গে না থাকে তাহলে ভোট হবে কোত্থেকে? গ্রামে ভোটের রাজনীতি 'কন্‌ট্রোল্' (নিয়ন্ত্রণ) করে সেই সমস্ত ধনী চাষীরা, যারা গ্রামে থেকে চাষবাস করে, শস্য গুদামজাত করে, ফাটকাবাজি করে। তা হলে, এই হচ্ছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের হুঙ্কার যারা ছাড়ছেন তাদের রাজনীতির আসল চেহারা। এ কি বিপ্লবের তত্ব? নাকি এ হচ্ছে বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই কিছু সংস্কারের কার্যক্রম?

বিপ্লবের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তিনটি শর্ত — সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব, সঠিক রাজনৈতিক লাইন ও সঠিক বিপ্লবী দল

তাই, লেনিনের সেই কথাটা আবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, বিপ্লবের তত্ত্ব ও রাস্তা ঠিক হওয়া দরকার, আর দরকার বিপ্লবের পার্টি ঠিক হওয়া। এই তিনটি শর্ত যদি আপনারা পূরণ করতে না পারেন তা হলে অনেক লড়াই আপনারা ইতিপূর্বে করেছেন, আবারও করবেন, কিন্তু শুধু লড়াই লড়াই খেলাই হবে। সেজন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে করতেই এগুলি নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে। একত্রে লড়তে লড়তে ভাবুন। লড়তে গিয়ে অন্য ইউনিয়নের সঙ্গে মত পার্থক্য কোথায় এবং কেন, তা বোঝবার চেষ্টা করুন। আপনাদের সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা হওয়া উচিত যাতে রাজনৈতিক মতবাদ আলাদা হওয়া সত্বেও একটাই ইউনিয়ন গড়ে তোলা যায়।

এর জন্য চাই রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিতর্কের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতা। নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ অপরকে বুঝিয়ে, আদর্শের জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যদি কেউ নেতৃত্বে আসে তাহলে আপত্তির কী থাকতে পারে? কিন্তু অপরের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, সমালোচনার অধিকারকে কেড়ে নিয়ে কেউ যদি শুধু কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নেতৃত্ব করতে চায় তাহলে 'ফ্যাক্‌শনালিজম' বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গঠনের মনোভাব তো আসবেই। আর এই ফ্যাক্‌শনালিজম মানেই অযথা আমাদের সকলেরই সময় নষ্ট। একে অপরের বিরুদ্ধে চলতে গিয়ে, কাজ করতে গিয়ে যথার্থভাবে শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ও সংগঠন গড়ে তোলার দিকে আত্মনিয়োগ করতে পারি না। সেজন্য শ্রমিকদের একটা মাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলার পক্ষে বাধা হ'ল — 'ইমপেসেন্স' (অধৈর্য) বা 'ল্যাক অব ফিলোসফিক্যাল টলারেন্স' (আদর্শগত অসহিষ্ণুতা)। অপরের মত শুনব না, আলোচনা করতে দেব না, 'গ্যাগ্' করব (চেপে দেব), তাহলে তো 'স্প্লিট' (ভাঙন) হবেই। কারণ মত কখনও পদানত থাকতে পারে না। আপনি যেমন আপনার মতে বিশ্বাস করেন, অপরে ভুল হলেও তার নিজের একটা মত আছে, সে তাতে বিশ্বাস করে। এই দু'টি মতের খোলাখুলি সংঘর্ষের সুযোগ থাকা দরকার। আপনি আমার উপর আপনার মত চাপাতে চাইলে, আমি তা মানতে পারি না। তাই খোলাখুলি মত বিনিময় হলে, প্রকাশ্য আলোচনা-সমালোচনা হলে, জনসাধারণের সুযোগ থাকে — কে ঠিক আর কে বেঠিক বোঝবার। আপনি যদি ঠিক থাকেন, আলোচনায় আপনার তো কোন ভয়ের কারণ নেই। বরং আলোচনায় আপনার জয় তো সুনিশ্চিত। যে ভুল জায়গায় আছে, মিথ্যা আঁকড়ে আছে, যার দুর্বলতা আছে সে-ই আলাপ-আলোচনা, মতাদর্শগত সংঘর্ষে ভয় পায়। শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে, ঐক্যের নামে নানা অজুহাতে সেই কেবল কর্মী ও সমর্থকদের এই খোলাখুলি আলোচনার বাইরে রাখে। জনসাধারণকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। আপনারা সেই পথ পরিত্যাগ করুন। মতের বিনিময় ঘটান। এই পথেই শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল করার চেষ্টা করুন।

সংগ্রাম আপনাদের করতেই হবে। এমন কথা নয় যে আপনারা লড়বেন না। পেট বড় বালাই। আজ যদি ভাবেনও যে লড়াই করে কিছু হবে না — দু'দিন বাদেই আবার লড়াইয়ের ময়দানে নামতে আপনাদের হবেই। ইতিমধ্যেই তার আভাস দেখা যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক মাঠে-ময়দানে আসবেন, লড়াই শুরু করবেন কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হবে না। অবস্থা পরিবর্তন করতে গেলে দরকার সেই তিনটি জিনিস — সঠিক মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক বিপ্লবী

তত্ত্ব এবং সঠিক বিপ্লবী পার্টি। এ যদি না থাকে, রাস্তা যদি ভুল হয়, তাহলে সততা, কোরবানি, সংগ্রাম কোন কিছুর দ্বারাই আপনারা সামনে দিকে এগোতে পারবেন না। তাই আবার সেই লেনিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলি — যত গণতান্ত্রিক আন্দোলনই করুন, যত দাবিদাওয়া নিয়ে লড়ুন, শহীদ দিবস করুন, বুকের রক্ত ঢেলে দিন, ধর্মঘট ও আন্দোলনে পুলিশের সাথে যতই মোকাবিলা করুন — আপনারা যে গোলাম সেই গোলামই থাকবেন। যে পুঁজিবাদ সেই পুঁজিবাদই থাকবে, শোষণ অব্যাহত থাকবে। দশ টাকা, তিরিশ টাকা মাইনে হয়তো বাড়বে। কিন্তু বাজারে জিনিসপত্রের দাম এমনিই বেশি, এর উপর বাড়বে অনেকগুণ বেশি। আবার মাইনে বাড়ানোর জন্য লড়বেন, রক্ত ঢালবেন, পাঁচ টাকা বাড়াবেন, ফের জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। শুধু তাই নয় — এই অনিশ্চয়তা, উদ্দেশ্যহীনতা নৈতিক জীবনেও অবক্ষয় ডেকে আনবে। যে সুখের স্বপ্ন দিয়ে পরিবার গড়ে তুলেছেন, পরিবারের মধ্যে, আপনার একান্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেও বর্তমান সমাজের যে 'সোস্যাল ম্যালাডি' (সামাজিক ব্যাধি) রয়েছে তার ছাপ পড়বে, সেগুলো ঢুকে যাবে। আপনি সুখের পরিকল্পনা করে, অনেক স্বপ্ন নিয়ে ঘর গড়েছিলেন। ঘরে গিয়ে দেখবেন সে সংসারও থাকছে না। যে স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে যাচ্ছেন সেখানেও দেখবেন শান্তি নেই, ভালবাসা নেই। যে সন্তান-সন্ততির জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার কম করছেন না, এমনকী কোন কিছুরই পরোয়া করেননি, সেগুলিই দেখবেন — এক একটা এক এক মূর্তি — কোনটা চিত্রাভিনেতার চেলা, কোনটি কোথাকার কোন্ খেলোয়াড়ের চেলা হয়ে বসে আছে। অর্থাৎ এক কথায় আপনি আপনার 'কিথ্ অ্যান্ড কিন্'-দের (আত্মীয় পরিজনদের) নিয়ে একদম বিচ্ছিন্নভাবে — সাতে নেই, পাঁচে নেই, ঝুট্‌ঝামেলায়, রাজনীতিতে কোন কিছুতেই নেই, শুধু চাকরি-বাকরি আর খাওয়া-দাওয়া ঘুমের মধ্যে থেকেও নিজেকে এর হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। সামাজিক সমস্যার ভূত আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবন বিষাক্ত করে দেবে। ভালবাসা নষ্ট করে দেবে। আপনার স্নেহ-মমতা পর্যন্ত ধ্বংস করে দেবে। বাঁচতে হলে লড়াই আপনাদের করতেই হবে। আর এই লড়াইটা করতে হবে বিপ্লবের রাস্তায়। বিপ্লবের রাস্তা মানে 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে শুধু চিৎকার নয়। বিপ্লবের সঠিক স্তর, রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে সঠিক সুস্পষ্ট ধারণাকে ভিত্তি করে, সঠিক বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে মজুরদের যদি সংগঠিত করতে পারেন, উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষায় যদি শিক্ষিত করে তুলতে পারেন তবেই আপনারা জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে পারবেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন এবং

রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তখনই আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ভারতবর্ষের কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষগুলো দেখবে বিপ্লবের মুখ। তার আগে পর্যন্ত শুধু বিক্ষোভ আর পরাজয়। শুধু বিস্ফোরণ আর পরাজয়। এর হাত থেকে মুক্তি, সমাজের মুক্তি, মানুষের মুক্তির রাস্তা একটাই — তা হ'ল বিপ্লবের রাস্তা। এছাড়া ভিন্ন কোন পথ নেই।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য রক্ষা ও বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনীতিবাদ, সুবিধাবাদ ও বিভিন্ন ধারার সোস্যাল ডেমোক্রেসির চূড়ান্ত অনুপ্রবেশের ফলে পুঁজিবাদী শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণআন্দোলন এবং শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। অথচ আন্দোলন গড়ে তুলতে এই ঐক্য অত্যন্ত জরুরি। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামনে কী কী মূল সমস্যা, বিপ্লবী শ্রমিকদের কী পদ্ধতিতে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, উন্নত রুচি সংস্কৃতির এবং বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতার আধারে কীভাবে ধাপে ধাপে আন্দোলন গড়ে তুলে বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে — এ বিষয়ে ১৯৭৪ সালের এই ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কমরেড সভাপতি ও উপস্থিত কমরেডস,

আজকের শ্রমিক কর্মচারীদের এই যে ডেলিগেট সেশন আরম্ভ হয়েছে, তাতে আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা কী সে সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা বলে শ্রমিক সংগঠনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপদ্ধতি কী ধারায় হওয়া উচিত এবং এখানেও আপনাদের কাজকর্মের ধারা, রাজনৈতিক প্রচার কী হবে, কী হলে ভাল হয়, আপনাদের কাজের পক্ষেও সুবিধা হয় — সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমি আমার বক্তব্য রাখব।

প্রথমত, ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের ইতিহাস। দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব বা তথাকথিত বিপ্লবী বলে পরিচিত নেতৃত্বে বহু বড় বড় শ্রমিক সংগঠন ও সংস্থা এদেশে দীর্ঘদিন থেকে গড়ে উঠেছে। আন্দোলনে জোয়ার-ভাটা আছে, কখনও দু'পা জোর কদমে চলেছে কখনও দু'পা পিছু হটেছে, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র যা সাধারণভাবে দাঁড়িয়েছে, এতদিনের এত লড়াই-এর পরেও — সেটাই লক্ষণীয় বিষয়। সেই ১৯২০ সাল থেকে ধরুন এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের শুরু কার্যকরীভাবে। এই সময়ের মধ্যে বহু ধর্মঘট হয়েছে।

এমন কোনও ইন্ডাস্ট্রি (শিল্প) নেই, ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমি শুধু একটা ফ্যাক্ট্রি (কারখানা) বোঝাচ্ছি না, সে ইঞ্জিনিয়ারিং বলুন, স্টিল বলুন, পোর্ট অ্যান্ড ডক (বন্দর বা জাহাজী শিল্প) বলুন, রেলওয়ে বলুন, জেনারেল টেক্সটাইল (বস্ত্র শিল্প) , পাট শিল্প বলুন, চিনিকল বলুন, ছোটখাট এমনি ইন্ডাস্ট্রি বলুন — যত ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আছে, সর্বত্রই কমবেশি ইউনিয়ন আছে এবং দীর্ঘদিন ধরে আছে।

এই ইউনিয়নগুলি এমনি এমনি আছে, এমন নয়। ইউনিয়ন আছে মানেই কখনও না কখনও নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে তার লড়ালড়ি আছে, এবং বহু লড়ালড়ি হয়েছেও। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতভেদ সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, যা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিধির মধ্যে পড়ে — মজুরকে তাদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার হয় তার বিরুদ্ধে বা তাদের যে সমস্ত ন্যায্য দাবি-দাওয়া আছে তা নিয়ে লড়বার জন্য গড়ে তুলতে হয়। এই দাবিগুলো বিনা লড়াইতে এই শোষণমূলক ব্যবস্থায় পূরণ হয় না। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিক বা ম্যানেজমেন্টের হাত থেকে কিছু পাওয়ার উপায় হিসাবে মজুরদের নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ মজুররা অসংগঠিত থাকলে, মালিক এমনকী নিজেদের তৈরি আইন-কানুনগুলোকে পর্যন্ত নিজেরা মেনে চলে না, এটা আপনারা সকলেই জানেন। অথচ এই যে মজুরদের ইউনিয়ন, যা দিয়ে আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলি, তার একটা ঐক্য পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে রাখা যায়নি। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন। কতগুলো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পর্যন্ত, দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ বিভক্ত হয়ে দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত, গোটা দেশে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ছিল এ আই টি ইউ সি। বিভেদপন্থার জন্য ১৯৩০ সাল নাগাদ একবার তাতে ফাটল ধরেছিল। ১৯৩০-৩১ সাল নাগাদ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এ আই টি ইউ সি-তে এই ভাঙন কার্যকর হয়। এম এন রায়ের দল একসময় ফেডারেশন অব লেবার নামে একটা স্বতন্ত্র সংস্থা খাড়া করেছিল। কিন্তু সেটার এমন কিছু প্রভাব বা কার্যকারিতা ছিল না। তাহলে এ আই টি ইউ সি-কে ধরুন, সেখানে ১৯৩০ সাল নাগাদ উগ্রবামপন্থী রাজনীতির বিভ্রান্তির জন্য এই বিভেদ এসেছিল এবং রেড ট্রেড ইউনিয়ন নামে নতুন একটা সংস্থা রণদিভেরা গড়েছিলেন।

বারবার চেষ্টা হয়েছে শ্রমিক ঐক্যের, সকলেই বলেছে ঐক্য চাই। আর যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি নিজে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, কার্যকারিতার দিক থেকে উপলব্ধি করি যে, রাজনৈতিক মতবাদিক সংঘর্ষ যাই থাকুক, উচিত অর্থে অর্থাৎ যা হওয়া উচিত, যেটা মডেল হতে পারত, সেই

দৃষ্টিতে দেখলে মজুরদের ডেমোক্রেটিক ব্যাটল-এর (গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের) প্ল্যাটফর্ম বা ফোরাম (মোর্চা বা সংস্থা) একটাই থাকা উচিত এবং এদিকে সবাই সচেষ্ট হলে ভালই হত। আমার কথা হল, লেট দ্য পলিটিক্যাল পার্টিজ উইন ওভার দ্য ওয়ার্কার্স, রাজনৈতিক দলগুলি শ্রমিকদের তাদের স্বমতে বুঝিয়ে জয় করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক। তবে এই স্বমতে নিয়ে যেতে হবে, জোর করে নয়, নিজের কথাগুলি জবরদস্তি মানিয়ে নেওয়ার জন্য নয়, কমিটিগুলিকে 'ক্লিক' করে বা জবরদস্তির পদ্ধতিতে দখল করে নয়। আমি বলি রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করে, মজুরশ্রেণীকে সপক্ষে টেনে এনে, আদর্শের জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে যদি কোনও পার্টি কোনও ইউনিয়ন কন্ট্রোল করতে পারে তো করুক। সেখানে আমি কেন লোককে বুঝিয়ে আমার পক্ষে আনতে পারলাম না, তার জন্য রাগারাগি করে আমি আলাদা করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারি না, অথচ এই পদ্ধতিতে বারবার বিভেদ হয়েছে এবং হচ্ছেও। আমার কথা, আমার সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আমার রাজনীতি, আমার কর্তৃত্ব আমি অপরের উপর চাপিয়ে দেব, এ হল জবরদস্তির পদ্ধতি। এ চলতে পারে না।

কমরেডস, এটা একটা গুরুতর সমস্যা। শ্রমিক আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেয় সেই রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গতকালই (প্রকাশ্য সম্মেলনের ভাষণে) আমি একবার বলেছি, এই যে শ্রমিক আন্দোলনে বারবার ফাটল ধরেছে, ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে, আই ডোন্ট ফাইন্ড এনি রিজন্, কোনও সঙ্গত কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। রাজনৈতিক মতবাদে পার্থক্য আছে বলে, শ্রমিকদের দৈনন্দিন আন্দোলনের যেটা হাতিয়ার, যেটা গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের যুক্ত মোর্চা, ডেমোক্রেটিক ব্যাটল-এর যেটা হল ইনস্ট্রুমেন্ট, হাতিয়ার বা ফোরাম তাতে বিভেদ আনার কোনও কারণ আছে কি? আমি মনে করি দেয়ার ইজ নো আর্থলি রিজন ফর ইট, এর কোনও সঙ্গত কারণ নেই। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জন্য ডেমোক্রেটিক ফোরামে, প্ল্যাটফর্মে বিভেদ আনার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। দলের নেতৃত্ব অর্থাৎ বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এটা অপরিহার্য নয়। যারা বলে অপরিহার্য তারা বিপ্লব কোনও দেশেই করেনি বরং তারা সব দেশে বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে, ফ্যাকশনালিজম (গোষ্ঠীচক্র গড়ার কাজ) করেছে, মজুরদের মধ্যে বিভ্রান্তি এনেছে। বিপ্লব যারা করেছে তারা সর্বযুগে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধ মোর্চা যেটা হবে সেখানে ঐকমত্যের ন্যূনতম কর্মসূচির উপর সর্বোচ্চ পরিমাণে জনগণের ঐক্য রাখা যায় কি না। ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (গণতান্ত্রিক আন্দোলন) হল একটা জায়গা যেখানে এগ্রিড মিনিমাম প্রোগ্রাম (ঐকমত্যের

ন্যূনতম কর্মসূচি) অতি সহজেই গড়ে তোলা যায়। তাদের মতে যেগুলো ন্যায্য দাবি, জনগণের তরফ থেকে যে ন্যায্য দাবিগুলো তোলা দরকার, তা নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে একটু-আধটু মতপার্থক্য থাকলেও এই মতপার্থক্য খুব একটা ফান্ডামেন্টাল নেচারের (মৌলিক চরিত্রের) হয় না। এক্ষেত্রে ঐক্য গঠনের কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। একটা কমন এগ্রিড প্রোগ্রাম, একটা চার্টার অব ডিমান্ডস (দাবি সনদ), বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী দলগুলি, মোটামুটিভাবে সব দলগুলির মধ্যে না হলেও, বেশিরভাগ দলগুলির মধ্যেই হওয়া সম্ভব। তাহলে ঐক্য হবে না কেন? এই ঐক্য বজায় রাখতেই বা পারব না কেন? বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে সংগঠন খাড়া করতে হবে, এই জন্য কি? না, তার জন্য বিভেদ আনার দরকার নেই। বরঞ্চ এর জন্য ঐক্য দরকার। যত মজুরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারব, তত অবিপ্লবী বা অ-শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলোর পক্ষে আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্ম থাকার ফলে মজুরদের মধ্যে বিভ্রান্তি প্রচারের যে সুযোগ থাকে, তা আর থাকবে না।

একসঙ্গে কাজ করলে, মজুররা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের পরিকল্পনা, চিন্তাভাবনা, লড়াই পরিচালনা করার কায়দা, কর্মী-নেতাদের আচরণ, রুচি, অভ্যাস, সংস্কৃতি, চরিত্র — এই সবগুলোই এক সঙ্গে পাশাপাশি রেখে বিচারের সুযোগ পায়। এর ফলে মজুর সংগঠনের উপর বিপ্লবী নেতৃত্ব আরও তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়, সহজ হয়। কাজেই কোনও সত্যিকারের বিপ্লবী দলই, বিপ্লবী নেতৃত্বে মজুর সংগঠনকে আনতে হবে বলে শ্রমিক আন্দোলনের ডেমোক্রেটিক প্ল্যাটফর্ম, ফোরাম বা ইউনিয়নে বিভেদ আনতে চায় না। আমরাও তাই এর পক্ষপাতী নই। তাহলে এ জিনিস ঘটছে কেন? অনেকেই হয়ত এ প্রশ্নটি করবেন। এটা জানতে হলে বুঝতে হবে এটা ঘটে কেন? কেউ স্বীকার করুন আর নাই করুন, যে কারণে এটি বারবার ঘটেছে তার কারণ হল দুটো, যা আমরা আগে বলেছি।

নিজেদের বিপ্লবী দল বলে মনে করে এমন একটি দল মনে করছে, সরাসরি তার নেতৃত্বে সংগঠন না হলে যারা প্রতিক্রিয়াশীল তাদের নেতৃত্ব সংগঠনের উপর কায়েম হবে। তারা সংগঠনে থাকলে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কোনও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন খাড়া করা যাবে না। হয় এই সঙ্কীর্ণ ধারণার বশবর্তী হয়ে উগ্রতা থেকে আলাদা সংগঠন হয়েছে, যেমন '৩০ সালে হয়েছিল একবার। এ কাজ করেছিল আমাদের দেশের বর্তমানে মূলত তিনভাগে বিভক্ত এই কমিউনিস্ট নামধারী দলটি। বি টি রণদিভের নেতৃত্বে তারা রেড ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে এ আই টি ইউ সি-র মধ্যকার ঐক্য ভেঙেছিল। আর না হয়, যে পার্টি

কোনও কারণে একটা সময় ইউনিয়নের নেতৃত্বে এসে অপরের কোনও বক্তব্য উপস্থাপনা করার সুযোগই দেয় না, যে ক্লিক (ষড়যন্ত্রমূলক কাজ) করে, কোটারি (চক্র তৈরি) করে, জবরদস্তি করে, নিজের মতামতকে জোর করে চাপিয়ে দেয়, সেই পার্টি তার ফ্যাসিস্ট সুলভ আচরণের দ্বারা ঐক্য ভাঙে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে, একত্রে অপরের সঙ্গে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আদর্শগত সংগ্রাম চালাবার সাথে সাথে কীভাবে ঐক্য বজায় রাখতে হয়, ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে হয়, এ অভ্যাস তার আয়ত্তে নেই। এই ধরনের পার্টিগুলি একবার যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখল করলেই, ইউনিয়নের কর্তৃত্ব দখল করলেই, অন্যকে জবরদস্তি পদদলিত করে। এটাও পেটিবুর্জোয়া অবিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

বিপ্লবী হলে এইসব দল বুঝত, সংগঠনে ঐক্য রাখার প্রয়োজন তারই সবচেয়ে বেশি। যত মজুরদের মধ্যে ঐক্য রাখা যায় এবং একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে মজুরদের সংগঠন করা যায় তত মজুরদের আন্দোলন যেমন জোরদার হয়, তেমনি মজুরদের পক্ষেও বিভিন্ন পার্টিগুলোকে বিচার করে নেওয়ার, পার্টিগুলোর অভিমত ও মতাদর্শগুলি, আন্দোলন পরিচালনার কায়দা ও কৌশলগুলি বিচার করে নেওয়ার, বিভিন্ন দলের নেতাদের কর্মীদের চরিত্রগুলো দেখে, শুধু তাদের মুখের কথা শুনে নয়, তাদের আচার-আচরণ, অভ্যাস, কীভাবে তারা কাজকর্ম চালায়, এই সমস্ত দেখে তাদের বিচার করে নেওয়ার সুযোগ বেশি হয়। তাই বিপ্লবী দল কখনও গণআন্দোলনের ঐক্য ভাঙতে চাইবে না। ঐক্য রাখতে চাইবে, পারুক আর নাই পারুক। কারণ রাখবার ইচ্ছা করলেই, সবসময় সে ঐক্য রক্ষা করতে নাও পারে, শুধু তার ইচ্ছার উপর সবকিছু নির্ভর করে না। বহু শক্তি এবং পরিবেশ, যেগুলো তার বিরুদ্ধে কাজ করছে, যে সমস্ত ঐক্যবিরোধী শক্তি কাজ করছে, শক্তির ভারসাম্যের দিক থেকে তাদের যদি ক্ষমতা বেশি হয়, আর সেই ক্ষমতাটা যদি ঐক্য গড়ার পক্ষে না গিয়ে ঐক্য ভাঙার পক্ষে যায়, তাহলে বিপ্লবীদের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে ঐক্য রাখা যায় না — যেমন, ইতিহাসে বারবার ঐক্য ভেঙেছে, ভাঙা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বকারী দলগুলির এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই শ্রমিকদের ঐক্য রাখা যায়নি, বার বার বিভেদ এসেছে — রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য এই বিভেদ আসেনি।

মজুর আন্দোলনে এই যে বার বার বিভেদ এসেছে, একে যে রোখা যায়নি তা এই কারণে যে, সত্যিকারের বিপ্লবী দল, একমাত্র যে দল ঐক্য রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝে সেই দলটি যথেষ্ট শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্নভাবে দেশে মজুর বা গণআন্দোলনের নেতৃত্বে আজও অনুপস্থিত। উপযুক্ত ক্ষমতা ও শক্তি

থাকলে তবেই একমাত্র বিপ্লবী দল পারে অপর সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে। যে দলটি ঐক্য রাখার যথার্থ বাস্তব প্রক্রিয়াটি জানে সেই বিপ্লবী দল আজও তেমন শক্তির অধিকারী হয়নি। অন্যদিকে যে দল মুখে ঐক্য রাখার কথা বলে কিন্তু নিজেই একটি ঐক্য বিনষ্টকারী শক্তি, সেই দলের ক্ষমতা আজও বেশি। ক্ষমতা বেশি হলেই এরা অপরকে জোর করে আটকায় অথবা এরা ভাবে, আমি যখন বিপ্লবী তখন অবিপ্লবীদের সঙ্গে পাশাপাশি বসলেই আমার বিপ্লবী চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে, আমার পবিত্র ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এরা আসলে বিপ্লবীই নয়, বিপ্লবের নামে বিপ্লবের কথা বলে এরা ট্রুইজম-এর (নৈষ্ঠিক গোঁড়ামির) চর্চা করে। তাই বলছিলাম এই সমস্ত পার্টিগুলোর জন্য, এই সমস্ত ট্রেন্ডগুলোর (ঝোঁক) জন্য বারবার বিপ্লবী আন্দোলনে, মজুর আন্দোলনে বিভেদ এসেছে। তাহলে আপনাদের কী করতে হবে?

প্রথম কথা হচ্ছে, আপনাদের এখানেও যে ভাগ হয়েছে, যে বিভেদ এসেছে, যতটুকু আপনাদের দলিল পড়ে জানলাম বা আমি নিজেও যা জানি, তা এই একই কারণে হয়েছে। একসময় যুক্ত ইউনিয়ন গড়ে ওঠার আগে, প্রথমে যখন আমরা একটা ইউনিয়ন আলাদাভাবে গড়ে তুলি, তার থেকেই দুর্গাপুরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে খুব ডিটেলসে না হলেও কিছু কিছু আমি জানি। তাই এ সম্পর্কে আমি যতটুকু ওয়াকিবহাল তাতে ঐক্য ভাঙার কারণ হিসাবে কেউ যদি বলেন যে, আমাদের তরফ থেকে অর্থাৎ একটা বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, ধরুন সোজা কথায়, এস ইউ সি আই-এর যারা সমর্থক এবং কর্মকর্তা, তাঁদের জন্যই এই ঐক্য ভেঙেছে, তা আমি মানতে পারি না। মানতে পারি না এই জন্য যে এটা সত্য নয়। সত্য হলে এটা নিশ্চয়ই বিচার্য বিষয় এবং তাঁদেরকে চেপে ধরার প্রশ্ন — তাঁরা কেন এবং কোন বিপ্লবের স্বার্থে আলাদা ইউনিয়ন করেছেন? তার দ্বারা কী কাজ হবে? তাঁরা তো জানেন যে, এর দ্বারা শ্রমিকদের লড়াই করার শক্তি বিভক্ত হবে, শ্রমিকদের একসাথে লড়ে এবং লড়াইয়ের ময়দানে একসাথে সমস্ত দলগুলোকে সহজভাবে বিচার করে নেওয়ার যে সুযোগ ছিল সেই সুযোগ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হবে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্ম থেকে শ্রমিকরা যার যার নেতার বক্তৃতা শুনবেন এবং বক্তৃতা শুনে যার যার নেতাকে তারিফ করতে থাকবেন। এর দ্বারা শ্রমিকদের বিভ্রান্তি কাটাতে সহায়তা করা হয় না। শুধু বাইরের প্রচারের দ্বারা অপর দলের ভুল রাজনীতিকে পরিষ্কার করে এক্সপোজ করা যায় না বা মিথ্যা জিনিসটাকে ধরিয়ে দেওয়া যায় না। মিথ্যা — তা মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে, সত্যরূপে কাজ করে, সত্যরূপে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। না করলে, নাৎসিরা এবং হিটলারের

মতো একজন জঘন্য ফ্যাসিস্ট নেতা সমস্ত যুবসম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করল কী করে? হিটলারের নাৎসিবাদ কি সত্যকে প্রতিফলিত করেছিল? না, এটা মানবতার জঘন্যতম শত্রু, অনিষ্টকারী একটা দর্শন বা রাজনৈতিক তত্ত্ব ছিল? তা সত্ত্বেও জার্মানির শুধু আনকোরা যুবকরা নয়, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ইনটেলেকচুয়ালরা পর্যন্ত একটা সময় এর দ্বারা বিরাটভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিল। তাহলে সাময়িকভাবে হলেও মিথ্যা কি জয়যুক্ত হয় না? এ তো অবাস্তব কথা নয়। কেননা শুধু প্রচার করে ধরিয়ে দিলেই মানুষ সত্য জিনিসটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারে — ব্যাপারটা এত সহজ নয়। সত্য মিথ্যার মধ্যে ইন বিটুইন দ্য লাইনস (কথায় বা প্রকাশের মারপ্যাঁচ বা ফাঁকটুকু) বিষয় বুঝতে পারা অত্যন্ত কঠিন। তাই যুক্ত মোর্চায় পরস্পরকে পাশাপাশি দেখে বিচার করে নেওয়ার সুযোগটা, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের একটা প্রধান শর্ত। আমরা যখন ঐক্যের কথা বলি তখন তো আমরা সংগ্রামবিহীন ঐক্যের কথা বলি না। ঐক্যের মধ্যে নিরন্তর আদর্শগত সংগ্রাম রয়েছে, ঐক্যের মধ্যে মতপার্থক্যও রয়েছে। তাই আমরা যখন ঐক্যের কথা বলি তখন আমরা সংগ্রামের কথাও বলি। আমরা যখন অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলি তখন আমরা ঐক্যের জন্যও চেষ্টা করি। এ যদি আমরা না করি তাহলে সংগ্রামটা ইউজলেস (নিরর্থক), সংগ্রামের কোনও মানে নেই। এই কথাটা আপনাদের ভাল করে বুঝতে হবে।

একটি দল আপনাদের কথা বলতে দেয়নি, মুখ খুলতে দেয়নি, বিরুদ্ধ মত হলেই, নেতাদের সমালোচনা হলেই গায়ের জোরের রাজনীতি করেছে। এর মানে আমি একথা বলি না যে অন্য পার্টির প্রভাব বাড়ছে দেখলে, নিজেদের কর্তৃত্ব কমছে দেখলে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে লড়বেন না বা অপরের মত ভুল প্রমাণের চেষ্টা করবেন না এবং মজুরের কাছে তা হাস্যকর বলে দেখাবার চেষ্টা করবেন না। তা তাঁরা করুন, রাজনৈতিক আদর্শগত লড়াই পরিচালনা করে মজুরদের তাঁরা টেনে নিন, এতে কেউ আপত্তি করতে পারে না। কিন্তু তা না হয়ে বাস্তবে যা হয়েছে, তা হচ্ছে কোনও বিরুদ্ধ মতকে কথা বলতে দেব না। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে হোক, স্ল্যান্ডার (কুৎসা রটনা) করে হোক, ক্যারেকটার অ্যাসাসিনেশন (চরিত্র হনন) করে হোক, জবরদস্তি ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট (দৈহিক আক্রমণ) করে হোক, আমি তাকে মাথা তুলতে দেব না। এই মনোভাবের ফলে বাধ্য হয়েই যদি আপনাদের আলাদা ইউনিয়ন গড়তে হয়, ঐক্য যদি ভেঙে থাকে, তবে ঐক্য ভেঙেছে বলেই আমাদের আলাদা করে শুধু লড়ে যেতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে শুধু আমরা সমালোচনা করে যাব, ক্রিটিসিজম করে যাব, আদর্শগত আন্দোলন করে যাব এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের এক্সপোজই করব, আর

কিছু করব না, এ দৃষ্টিভঙ্গিও কিন্তু ভুল। এটা আপনাদের করতে হবে ঠিকই। তবে এর মধ্য দিয়ে আপনারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথাটা এবং ঐক্যের পথে বাধাগুলি কী কী তা যদি মানুষের সামনে বার বার তুলে না ধরেন এবং নিজেদের দিক থেকে নিঃশর্তভাবে এই ঘোষণাটি না রাখেন যে, অনৈক্যের পথে যে কারণগুলি কাজ করছে তা এলিমিনেটেড (অপসারিত) হলে আপনারা শুধু ঐক্যবদ্ধ হবেন তাই নয়, সেই ঐক্যকে রক্ষাও করবেন — নিজেদের দিক থেকে নিঃশর্তভাবে এই ঘোষণাটি যদি না রাখেন, তাহলে মস্ত ভুল হবে। যে কারণগুলি ঐক্য ভাঙছে মজুরের সামনে তা নিয়ত তুলে ধরে আপনারা তো এই কথাটা তাদের বলবেন, তোমরা মজুররা উদ্যোগ নিয়ে ঐক্যের পথে এই কাঁটাগুলি দূর কর। ইউনিয়নের নেতৃত্বে যে দল আছে তার যদি ক্ষমতা থাকে, তার যদি মেজরিটি সাপোর্ট থাকে, সে-ই নেতৃত্ব দেবে। সেটা কোনও প্রশ্ন নয়। আমার ক্ষমতা নেই, আমি তার জন্য রাগারাগি করব কেন? আমি মজুরদের ভোট পাইনি তার জন্য আমি রাগারাগি করব কেন? কিন্তু আমি যদি একটা সলিটারি ভয়েস, একক কণ্ঠও হই, আমার মতটা আমাকে বলবার সুযোগ দিতে হবে — এটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঐক্য রক্ষার একটা প্রধান শর্ত। এটা না করলে যে একক শক্তি সে তো একক বলেই অন্যের আনুগত্যে থাকতে পারে না। সে কীসের জন্য থাকবে? তাহলে তাকে ফ্যাক্শনাল ওয়ার্ক করতে হয়, আর তা নাহলে ক্লিক করতে হয়। সে তো আলাদা জিনিস। এগুলি তো বিপরীত দিক থেকে ঐক্য ভাঙার প্রক্রিয়াকেই বাড়াতে সাহায্য করবে।

এটা অন্য জিনিস। অনেক সময়, শত্রুশিবিরকে ভাঙার জন্য বিপ্লবীদের একাজ করতে হয়। কিন্তু এখানে তো আমি মজুর আন্দোলনে আছি, এটাকে তো আমি শত্রুশিবির হিসাবে ভাবছি না। যেখানে ঐক্য গড়তে পারিনি, অপরের একটা ইউনিয়ন যেটা প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতৃত্বে চলছে, তার থেকে মজুরদের মুক্ত করাই যেখানে প্রশ্ন এবং সেখানে যদি বাধ্য হয়েই আমাকে কাজ করতে হয়, তখনই তো আমার ফ্যাকশনাল ওয়ার্ক করার কথা ওঠে। কিন্তু যেখানে আমি মজুরদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা ভাবছি, সেখানে আমাকে বলতে দেওয়া হোক আর নাই হোক সেখানে ফ্যাকশনাল ওয়ার্ক-এর কথা আসে কোথা থেকে? ঐক্যের সঙ্গে তো ফ্যাকশনাল ওয়ার্ক-এর কোন সম্বন্ধই নেই। তা যদি হয়, এখানে আমার কাজ করার সুযোগ থাকবে না কেন? ইভ্ন ইফ আই অ্যাম এ লোন ম্যান, আই মাস্ট হ্যাভ দ্য রাইট টু স্পিক, আমি যদি একাও হই তবু বক্তব্য রাখার অধিকার আমার আছে ও থাকবে। আমার যদি ক্ষমতা না থাকে, মজুররা যদি আমাকে সমর্থন না করে, আমার কথা শোনার

পরও আমাকে সমর্থন না করে, অন্যকে করে — সে নেতৃত্ব দেবে। আমি সেই নেতৃত্বের অধীনেই এগ্রিড কমন প্রোগ্রাম-কে সমর্থন করব। কিন্তু সাথে সাথে আমার কোথায় বিরোধিতা, কোথায় অসুবিধা, কোথায় আমার মতপার্থক্য — সেগুলোও বলব। এই বলার অধিকার আমাকে দিতে হবে। এই মানসিকতা যদি বজায় থাকে, তাহলে অন্তত লেফটিস্ট পার্টি, মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট বলে যারা নিজেদের দাবি করে তাদের আলাদা আলাদা শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ইউনিয়ন বা ফোরাম থাকার কোনও কার্যকারিতা আমি দেখতে পাই না। বরং এটা ক্ষতিকারক। তাই বাধ্য হয়ে আলাদা ইউনিয়ন করতে হলেও, ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার এই দিকগুলি, ঐক্যের এই স্লোগানটি আপনাদের তুলে ধরতে হবে। এটা কোনও ট্যাকটিক্স নয়, ম্যানুভার-এর (সুচতুর পরিকল্পনার) বিষয়ও নয়, লোক ঠকানো একটা প্রোপাগান্ডাও নয় — এটা সত্যিই আপনারা চান। কারণ এটি যদি মজুরদের বুঝিয়ে শেষপর্যন্ত আপনারা আনতে না পারেন তাহলে আপনাদের অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর হবে। আপনারা কর্মী পাওয়ার দিক থেকে, আদর্শগত দিক থেকে হয়ত এগোবেন কিন্তু সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির দিক থেকে এবং বিপ্লবী নেতৃত্ব বলতে যেটা আপনারা বোঝেন, শ্রমিক আন্দোলনে সেই বিপ্লবী নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে, সময় আপনাদের লাগবে অনেক বেশি, বাধার সম্মুখীন হতে হবে আপনাদের অনেক বেশি।

বিপ্লবী কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণবিধি সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়

তাহলে যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে ঐক্যবিরোধী দু'টি মূল ইনগ্রেডিয়েন্টস (উপাদান) — একটা জবরদস্তি আর একটা সেকটেরিয়ান অ্যাটিচিউড (সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি)। এছাড়া আরও একটি বিষয় সম্পর্কে আমি বলতে চাই। তা হল বিপ্লবীর স্পর্শকাতরতা। অনেকে মনে করেন, অবিপ্লবীর সঙ্গে বসলেই, একসঙ্গে কাজ করলেই যেন বিপ্লবী চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে মার্কসবাদীরা, বিশেষ করে কমরেড লেনিন বার বার অনেক হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি এক সময় বলেছেন — বিপ্লবের প্রয়োজনে, বিপ্লবের প্রক্রিয়াতে যে ঐক্যের প্রয়োজন গড়ে উঠেছে, তাকে লক্ষ না করে, যারা অনেক সময় শত্রুর সঙ্গে, দুশমনের সঙ্গে এবং অবিপ্লবীর সঙ্গে প্রয়োজনেও একত্রে কাজ করতে পারে না, তারা আসলে নিজেদের ছায়া দেখে পালায়। তাদের নিজেদের মধ্যেই যে ভূত, তা দেখেই তারা ভয় পায়। আসলে তাদের নিজেদের চরিত্রে দৃঢ়তা নেই। তারা কোনও বিপ্লবীই নয়। তাদের জানতে হবে, হাউ টু ওয়ার্ক উইথ অল, ইভেন উইথ

ডিফিকাল্ট পিপ্‌ল — কীভাবে সবার সাথেই কাজ করা যায়, এমনকী গোলমেলে লোকের সঙ্গেও কাজ করা যায়। বিপ্লবীরা সবার সঙ্গেই কাজ করতে পারে, তাদের সে ক্ষমতা এবং চরিত্রের ভিত্তি থাকা উচিত। তবে সবার সঙ্গে কাজ করতে পারার ইচ্ছা বা ক্ষমতা আছে মানে এই নয় যে, সবার সঙ্গে কাজ করা যাবে। সবার সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারটা নির্ভর করে অনেকগুলি ফ্যাকটর-এর উপর। ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য যে বার বার ভেঙেছে তার মূল কারণ হচ্ছে এইগুলো।

অনেকে বলেন যে, যেহেতু স্বাধীনতার পর শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে, তাই পার্টি পার্টি সব আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন করেছে। শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার সাথে আলাদা আলাদা পার্টির আলাদা আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন করার কী সম্পর্ক আছে? স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিভিন্ন দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এবং সংগ্রামের যে রূপ ছিল, আজ শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তীব্রতা আরও বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, দলগুলির পরস্পরের রাজনৈতিক মতাদর্শের সংগ্রাম আরও বেশি তীব্র আকার ধারণ করার কথা। কিন্তু তা হয়নি, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সাধারণ মোর্চায় চিড় খেয়েছে। খেয়েছে এই দু'টি জিনিসের জন্য — সেকটেরিয়ান আউটলুক এবং জবরদস্তি, অপরকে ফাংশন করতে, কাজ করতে দেব না এই মনোভাবের জন্য।

সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির কথাগুলি মুখে বলব কিন্তু কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংখ্যালঘিষ্ঠকে পদানত করে রাখব, সংখ্যাধিক্যের জোর খাটিয়ে অন্যকে নিজের রাজনীতির অনুকূলে নিয়ে আসব। আমি যা বলব গোলামির মনোভাব নিয়ে নির্বিচারে তা মেনে নিলে দরকার হলে তাকে নেতা-টেতা করে দিতেও আমার আপত্তি নেই। অনেকেই এসব করে। আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা বলি, অনেক বড় মানুষের কথা বলি, কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে যারা আমরা নিজেদের দাবি করি তারা হিউম্যানিস্টদের (মানবতাবাদীদের) যে মূল্যবোধ, তা পর্যন্ত মেনে চলি না। আপনারা মনে রাখবেন, চাটুকারদের যে পছন্দ করে এবং প্রশ্রয় দেয়, সে নিজেও আসলে নোংরা লোক। কোনও বড় মানুষ জেনে বুঝে নিম্ন মানসিকতার শিকার হয় না; যে চাটুকার, পদলেহী অর্থাৎ যারা তোয়াজ করে, ফ্ল্যাটারি করে — তাদের সে পছন্দ করে না। তোয়াজ করছে বলেই তাদের নেতা করে দেয় না। মানুষের মধ্যে তাদের সম্পর্কে কোনও মোহ সৃষ্টিতে সাহায্য করে না। কেননা, নেতা কথাটার একটা মানে আছে। নেতা একটা মডেল। নেতা জনগণের মধ্যে সমাজবিপ্লবের পরিপূরক রুচি, ন্যায়নীতির ধারণা ও আদর্শকে প্রতিফলিত করে।

সেইজন্য একটি লোক যেহেতু তেল দিয়ে নাম করতে চায়, তাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি নেতা করে দিতে পারি না, ট্যাকটিক্স-এর অর্থেও এটা করা যায় কি? তাহলে আমি কত বড় সর্বনাশ করলাম। মানুষের সামনে একটা বুটলিকার-কে, চাটুকারকে নেতৃত্বের মডেল হিসাবে উপস্থিত করলাম, যে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য যে কোনও মানুষকে তেল দিতে পারে। অথচ অনেক তথাকথিত মার্কসবাদী নেতারাই আকছার এ জিনিস করছেন। এখানে কারোর নাম-টাম আমি করতে চাই না। তাঁরা কোনও বিপ্লবের প্রয়োজনে এটা করছেন না। যেহেতু কিছু লোক তাঁদের তেল দেয়, তাই তাঁরা সেই লোকগুলিকে প্ল্যাটফর্ম দেন। একবারও তাঁরা ভেবে দেখেন না যে, এই লোকগুলি নেতা হলে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতি, তাদের আদর্শবাদ কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছাবে।

শুধু স্লোগান দিয়ে কোনও দেশে বিপ্লব হয়নি। বিপ্লবের জন্য মানুষের একটা সুস্থ এবং সুষ্ঠু নৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে। মানুষগুলো যদি স্লোগান-মঙ্গার (স্লোগান সর্বস্ব) হয়, দলবদ্ধ থাকলে সাহসী, দলবদ্ধ না থাকলে যদি কুঁকড়ে যায়, কুকুর-বেড়ালের মতো লাঠি দেখলেই পালায় আবার নিজের হাতে লাঠি থাকলে মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না, তাদের উপর হামলা করে, তাহলে এই মানুষগুলোর দ্বারা বিপ্লব হয় নাকি? এই যে ব্লাডি ম্যানিয়াক (রক্তলোলুপতার) প্রবণতা, এতো বিপ্লবের বিরুদ্ধ শক্তি। এর দ্বারা সমাজ পরিবেশের মধ্যে ফ্যাসিস্ট মানসিকতা তৈরি হয়। মজুর আন্দোলনে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে আজ এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর আচরণ চলছে। শুধু বাইরের লোকের বিরুদ্ধে নয়, দলের অভ্যন্তরে, দলের বাইরে, যা কিছু ফিল্‌দি (নোংরা), যা মানুষকে বড় করতে, মহৎ করতে সাহায্য করে না, তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম হওয়া উচিত এবং এই সংগ্রাম শুধু বাইরের লোকের বিরুদ্ধেই নয়, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও।

নেতা হওয়ার প্রয়োজনটা কোথায়? নেতা একটি প্রয়োজনীয় ইনগ্রেডিয়েন্ট, যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই আপনাদের আন্দোলনে আপনারা যত বেশি সংখ্যক নেতা তৈরি করতে পারবেন, আপনাদের কাজের অগ্রগতি তত দ্রুত হবে। কিন্তু দেখা গেল, নেতৃত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নেতা কতকগুলি ভাইসেস-এর শিকার বনে গেল, নানা রকম ব্যক্তিবাদের শিকার, পপুলার জেসচার-এর শিকার বনে গেল। এই কথাগুলির মানে আপনাদের বুঝতে হবে। পপুলিজম মানে এমন সব আচরণ যা করলে সহজে নাম করা যায়। ঢং, চলাফেরা, ওঠা-বসা, কথা বলা, ঢিলে-ঢালা কায়দা প্রভৃতি সবকিছুর মধ্য দিয়ে সে সাধারণ লোকের কাছ থেকে সহজে প্রশংসা আদায় করে। এগুলোর দ্বারা সে কী করে?

সে যেমন তার নিজের ক্ষতি করে, তেমনি আন্দোলনের মধ্যে নেতার যে কাজটি করা দরকার, ঠিক তার বিরুদ্ধ জিনিসটি করে। অর্থাৎ লোকে যদি তার সংস্পর্শে আকৃষ্ট হয়, তাহলে তা ভুল ভাবে হয়। সাধারণভাবে সমাজ পরিবেশের যে নিম্ন মানসিকতা ও রুচির শিকার বনে যায় জনতা, তার সঙ্গে নেতার আচরণ, চলাফেরার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও একটা মিল খুঁজে পায় বলে তারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে জনতার মধ্যেও ঢিলে-ঢালা ভাব আসে। তাদের নেতাদের তারিফ করাটাও হয় বাজে ধরনের। তার ফলে এইসব নেতার সংস্পর্শে থাকার মধ্য দিয়ে জনতার রাজনৈতিক চেতনার মান ওঠার বদলে আরও নিচের দিকে নামতে থাকে।

ফলে, নেতা আমাদের চাই, কিন্তু এমন নেতা চাই, যে নেতার মতো আচরণ করে, যার দায়িত্ববোধ আছে, যে যেকোনও অবস্থায় নিজেকে সামাল দিতে পারে এবং অপরকে পথ দেখাতে পারে। যে নিজের আচরণের দ্বারা অন্যকে এই শিক্ষা দেয় যে, অসুবিধা হলেও, এমব্যারাসিং সিচুয়েশন (অস্বস্তিকর পরিস্থিতি) হলেও, নেতার দায়িত্ববোধ আছে, একজন সাধারণ লোকের মতো অসুবিধার দোহাই দিয়ে সমস্যা আছে বলে সে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। হি মাস্ট নো, হি ইজ নট অ্যান অর্ডিনারি ম্যান, তাকে বুঝতে হবে যে সে একজন সাধারণ মানুষ নয়, সে জানে হাউ টু হ্যান্ড্‌ল ইট, কীভাবে সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হয় সে জানে। সেজন্য নেতা বলতে শুধু নাম বোঝায় না, নেতা মানে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। অথচ এই ক্ষমতা অর্জন করার সংগ্রাম প্রতিনিয়ত চালিয়ে যেতে হয়, নেতা-মাত্রকেই তা জীবনভর করতে হয়, এমনি এমনি যে তা অর্জিত হয় না, সেটা অনেকে ধরতেই পারে না।

বর্তমান সমাজে বুর্জোয়া-প্রোলেটারিয়েটের যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে, সেই শ্রেণীসংগ্রাম বা শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রভাব আমাদের চিন্তা-ভাবনা-মানসিকতার ক্ষেত্রে, রুচি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়তই কাজ করে চলেছে। শ্রেণীসংগ্রাম কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, আন্দোলনের ময়দানে মজুর এবং মালিকের যে লড়াই চলছে শুধুমাত্র সেইখানেই নয়, ভাবগত ক্ষেত্রেও মজুর-মালিকের লড়াইটা হাজির হয়েছে এবং আপনারা চান বা না চান, তা আপনাদের মনের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। এর একটা অংশ মালিকের, একটা মজুরের। এইভাবে নিয়ত সেটা কখনও আপনাকে মালিকের বুদ্ধি জোগায়, আবার কখনও বা আপনাকে মজুরের বুদ্ধি জোগায়। এইভাবে আমাদের সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম বাস্তবত অবস্থান করে। প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজপরিবেশের ভাবনা-ধারণাগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই আপনাদের মধ্যে এসে বর্তায়। কোনও নেতা বা কর্মীই নিজেদের এই সামাজিক

পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে পারেন না। পারেন না বলেই প্রতিনিয়ত, যত বড় উঁচুদরের নেতাই হোন না কেন, তাঁকে সচেতন থাকতে হয়। নিজেকে রক্ষা করতে হলে তাঁকে সব সময় বুঝতে হয় যে, আমার মধ্যে যে মানসিকতা, চালচলন, স্টাইল ইত্যাদি প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে, সেগুলো বিপ্লবী জনসাধারণের বিপ্লবী উদ্দেশ্য এবং বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিংবা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এই সাবধানতা সত্ত্বেও আপনাদের মধ্যে অবিপ্লবী বুর্জোয়া চিন্তা-ভাবনা আসতে পারে এবং এলেই যে একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল তাও নয়। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আপনারা ঠিক সময়ে তা ধরতে পারলেন কি না এবং সময়মতো তা শোধরাতে সক্ষম হলেন কি না। এটাই আসল কথা। আপনাদের নিজেদের মধ্যকার অবিপ্লবী চিন্তা-ভাবনাকে যদি আপনারা নিজেরা ধরতে পারেন তবে সেইটাই সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। ধরতে পেরে হয়ত নিজেকেই নিজে ছি ছি করলেন এবং তার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যা যা করার দরকার তাও করলেন। কারণ, বাইরের লোকলজ্জা একজন বিপ্লবীর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় না। নিজের ভিতর থেকে লজ্জাটাই আসল কথা। এটাই একজন বিপ্লবীর প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত। তা না হলে বাইরের লোক বড় করলে আমরা বড় হব, বাইরের লোক লজ্জা দিলে আমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাব — এ হলে একজন বিপ্লবী একপাও চলতে পারবে না। কারণ, বিরুদ্ধ পরিবেশে একজন বড় বিপ্লবীর গায়েও সাধারণ মানুষ উত্তেজিত হয়ে অপরের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থুথু ছেটাতে পারে। তার জন্য বিপ্লবী ছোট হয়ে যায় কি? এমনকী তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে, রাস্তায় পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে। মেরে ফেলতে পারে সেই মানুষগুলো, যাদের জন্য সে সর্বস্ব দিতে বদ্ধপরিকর। তার দ্বারা বিপ্লবীদের বে-ইজ্জতি এবং অসম্ভ্রম হয় কি? না। পুলিশ যদি একজন সত্যিকারের বিপ্লবীর মতো বড় মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে থানা লক-আপে পেটায় তাতে যেমন তার বে-ইজ্জতি হয় না, আবার পুলিশ যদি তাকে 'স্যার'ও বলে তাহলেও তার সম্মান বেড়ে যায় না। যে সব বিপ্লবীরা এগুলোকেই মান-অপমানের ক্ষেত্রে বড় কথা বলে মনে করেন, তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। তাঁরা হয়ত জানেন না যে, এরই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ এবং বুর্জোয়া সমাজের 'অহম্', যা নানা মূর্তি ধরে ভোল পাল্টে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে। আমরা তো প্রফেসর হতে চাইনি, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইনি, পয়সা কামাতে চাইনি, নাম করতে চাইনি — আমরা বিপ্লবী হতেই চেয়েছি। কিন্তু বিপ্লবী হতে চেয়েও 'স্যার' শুনলে একটু গর্ব হয়! আর পুলিশ লক-আপে পেটালেই বে-ইজ্জত হয়! বিপ্লবীর ইজ্জত বে-ইজ্জতের ধারণা এরকম নয়। তার ইজ্জত বে-ইজ্জত তার নিজের মধ্যে, তা না

হলে তো মানুষ ওপরে তুললে তারা উপরে উঠবেন এবং মইটা কেড়ে নিলেই ধুপ করে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে ফেলবেন।

এই করে কোনও বিপ্লবীর চলতে পারে না — এইসব চেতনা এবং উপলব্ধিগুলো কর্মীদের মধ্যে এনে দিতে হবে। এনে দিলেই তারা সমস্ত প্রতিকূলতা এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার প্রেরণা পাবে।

তাই বিপ্লবী হিসাবে, একজন কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রাম একটি কঠিন এবং জটিল সংগ্রাম। যেমন, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে জনগণকে, শ্রমিকশ্রেণীকে অর্থনীতিবাদ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে জনতাকে সচেতন করে জনতার রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে বিপ্লবের আঘাতে ভাঙতে হবে — এত কথা একজন বিপ্লবী কর্মী জানার পরেও দেখা গেল যে, যখন তাঁর নিজের চাকরি চলে গেল, তখন উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করেছেন — বিপ্লব, পার্টি, ইউনিয়ন তখন তাঁর সব গোলমাল হয়ে গেল। অর্থাৎ যতক্ষণ নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তাঁর একটা চাকরি ছিল ততক্ষণ তার সঙ্গে বিপ্লবটাও ছিল। এ কথাটা তিনি একবারও ভাবেননি যে পার্টি ও বিপ্লবের প্রয়োজনে কখনও তাঁর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নও তো আসতে পারে? শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁর চাকরি যদি যায়ও তাহলেও তিনি শ্রমিক ইউনিয়নই করবেন এবং শ্রমিকরা তাঁকে যেভাবে রাখবে তিনি সেইভাবেই থাকবেন — এত কথা কর্মীটি এর আগে ভাবেননি। অনেকে অনেক কথা জানেন কিন্তু ভাবেন না যে, কোনও একজন কর্মী যদি ইঞ্জিনিয়ারও হন তাহলেও শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য, মেলামেশার সুবিধার জন্য দরকার হলে তিনি একটি কুলির কাজ বা বদলি শ্রমিকের কাজ নিয়েও কারখানায় ঢুকবেন। অথচ আমাদের এখানে কী দেখা যায়? শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজনে কোনও ইঞ্জিনিয়ার কর্মীকে একটি চাকরি করতে হবে বললে তিনি হয়তো তার প্রফেশন-এর (বৃত্তির) কাজ পাওয়ার চেষ্টা করেন, আর না পেলে বারবার এসে বলেন, কী করব, কাজ পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ হোয়াইট কলার এমপ্লয়ির যে মেন্টাল কমপ্লেক্স (লেখা-জোখার কাজ করার যে মানসিক গঠন) রয়েছে, তিনি তাঁর শিকার। তাঁর অবস্থা হচ্ছে একটা লেখাপড়া জানা লোক হয়ে কী করে তিনি ম্যানুয়াল লেবার-এর (কায়িক শ্রমের) কাজ করেন? তাঁর সঙ্গে খাপ খায় এরকম একটা কাজের বন্দোবস্ত যদি করে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা তিনি করবেন, অর্থাৎ কাজটা করে তিনি বিপ্লব করবেন, কিন্তু সে কাজটাও তাঁর একটু মনোমতো হওয়া দরকার। কাজটা মনোমতো যদি না হয়, তাহলে বিপ্লবের জন্য যা করা দরকার তা তিনি করতে পারেন না। এই যে

মানসিকতা, যুক্তি এবং দেখবার ভঙ্গি, এসব যুক্তিধারা এবং ধারণাগুলি আসছে কোত্থেকে? বিপ্লবের এত কথা জানলেও এই চিন্তাগুলো তাঁর মধ্যে বিপ্লবী চিন্তার পাশাপাশি এই কারণে চলছে যে, এই বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত অবসোলিট (গলিত) ভাবনা-ধারণাগুলি জীবনযাত্রার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে তার প্রতিও তাঁর আগ্রহ কম নয়। এইভাবেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রভাব ভাবগত ক্ষেত্রেও প্রতিটি ব্যক্তির জীবনেই বর্তাচ্ছে। একটি বিপ্লবী কর্মীকে এ সম্পর্কে সব সময়ই সচেতন থাকতে হয় এবং বিপ্লবী হিসাবে জীবনকে গড়ে তোলার জন্য নিয়ত সচেতন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়।

বিপ্লবী কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার প্রাথমিক স্তরে আর একটি ট্রেন্ড অনেকের মধ্যেই কাজ করে। যেমন, আমার দাদাস্থানীয় একজন, এখানে আসতে আসতে আমাকে বলছিলেন যে, একটি ছেলে স্টিল প্ল্যান্ট-এ কাজ করে, অত্যন্ত সোস্যাল (মিশুকে), পাড়ায় আড্ডা দেওয়া থেকে শুরু করে মড়া পোড়ানো, দুর্গাপূজা প্রভৃতি প্রতিটি ব্যাপারেই তার প্রচণ্ড ইনিশিয়েটিভ (উদ্যোগ) । সকলের সে লিডার, সকলেই তাকে পছন্দ করে, ভালবাসে। কিন্তু তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। রাজনীতি ও বিপ্লব বোঝার পর দেখা গেল সে আর কারোর সাথে মেশে না, পাড়ার পাঁচটা কাজের মধ্যে নেই। ছেলেরা আর তাকে মানে না। রাজনীতি বোঝার পর তার নেতৃত্ব তো আরও পাকাপোক্ত হওয়ার কথা, লোকের তাকে আরও পছন্দ করার কথা। তা উল্টো ঘটনা ঘটছে কেন? ঘটছে দুটো কারণে। প্রথম, সে যখন বিপ্লবী হচ্ছে, শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই সে এতদিন যে মানুষগুলোর সঙ্গে ছিল, সচেতন ভাবে না হলেও তাদের সম্পর্কে খানিকটা অবহেলা করতে শুরু করে। যাদের সঙ্গে এতদিন মহানন্দে কাটিয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভাবতে শুরু করে যে, কী সব বাজে লোক; এরা নিজেদের মধ্যে যা আলোচনা করে তা কানেও নেওয়া যায় না। ফলে যারা তার কাছে কথায় কথায় আসত, কুকুরের ঘ্রাণশক্তির মতো ইনটুইশন-এ তারা ফিল করতে পারে (বুঝতে পারে) যে এ লোক আর আমাদের লোক নয়; এবং খানিকটা ভয়ভীতিতে বা খানিকটা ভুল বুঝেও তার থেকে দূরে সরে যায়। দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই বিপ্লব বোঝার সাথে সাথেই সে তাদের পেলেই বক্তৃতা করে, ধরেই 'লেকচার' দেয়। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে মাস্টার মশায়ের মতো এত সারগর্ভ ভাষণ কার শুনতে ভাল লাগে? ফলে এরা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তাকে দেখলেই পালিয়ে যায়। মানে, আগে যার কাছে দশবার যেত, এখন তাকে একদিক থেকে আসতে দেখলে, 'এইরে, লেকচার দিতে আসছে' ভেবে সঙ্গে সঙ্গে ঐদিক দিয়ে পালিয়ে যায়। এগুলি কী ইন্ডিকেট (ইঙ্গিত) করে?

ইঙ্গিত করে যে বিপ্লব তার ভালভাবে বোঝা হয়নি। বিপ্লব ঠিক মতো বুঝলে সে বুঝত যে, এইসব খারাপ মানুষগুলোর মধ্যে, নিপীড়িত মানুষগুলোর মধ্যে থাকার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। যেমন আগের দিনে ধর্ম প্রচারকরা মনে করতেন।

আর তাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে, আমাকে এমন স্টাইল-এ মিশতে হবে যাতে তারা আমাকে ছেড়ে যেতে চাইলেও, আমি ছেড়ে যাব না। আমাকে আমার নিজের অস্তিত্বটি, বিপ্লবী সত্তাটি বিসর্জন দিলে চলবে না। অর্থাৎ আমি তাদের বন্ধু হব, ইয়ার হব না, আবার প্রিচার-ও (প্রচারক) হব না, আমি বিপ্লবীই থাকব এবং তার বন্ধুও থাকব। এগুলো একসঙ্গে করার স্টাইল-টি আয়ত্ত করতে পারলে কারোর সঙ্গে থাকার অসুবিধা আমার হয় না। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই উল্টো হয়। হয় মিশতে গিয়ে ইয়ার হয়ে যায়;ফলে তাদের পরিবর্তন কিছুই করা যায় না, কিছু শেখানোও যায় না বরং নিজে যতটুকু বিপ্লব বুঝেছিলাম আস্তে আস্তে সেটুকুও চলে যায়। আমার চরিত্রটিও নষ্ট হয়ে যায়। আর না হয় তাদের কাছে আমি ভীতির কারণ হয়ে পড়ি। এগুলি ভাল করে একজামিন করলে, সাইকোজেনেসিস (মানসিকতায় এগুলি উৎপত্তির কারণ নির্ণয়) করলে দেখা যাবে এ সমস্তই বুর্জোয়া সমাজ থেকে আহরিত কুসংস্কার বা চিন্তাগত, ভাবগত বিভ্রান্তি, যেগুলি প্রমাণ করে যে, বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের কারেক্ট গ্র্যাস্পিং (সঠিক উপলব্ধি) হয়নি।

প্রতিটি কর্মীর কাজ হচ্ছে তার ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভিত্তিতে ক্রমাগত জনসংযোগ বাড়িয়ে যাওয়া। ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলতে আমি বোঝাতে চাইছি যে, সংগঠন আমাকে একটা প্রোগ্রাম দিচ্ছে, কতকগুলি দায়িত্ব দিচ্ছে, সেগুলি আমি করছি, আবার সংগঠন কাজ না দিলে আমি কাজ সৃষ্টি করছি। এরকম নয় যে, কাজ দিতে না পারলে আমি করছি না এবং বলছি, আপনারা তো কাজ দেননি। অথচ, একজন সচেতন কর্মী সংগঠন যে কাজগুলি দেয়, সেগুলি তো করেই, তার উপর সে নিজে কিছু কাজ সৃষ্টি করে। একজন সচেতন বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী অর্থেই আমি আমার রুচি, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক জ্ঞান এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নিয়েই জনগণের মধ্যে থাকি বলে আমার চিন্তাগত এবং সংগঠনগত প্রভাব তাদের উপর বর্তায়। ফলে তাদের জীবনের নানা সমস্যা, যেগুলো হয়ত সাংগঠনিক পরিকল্পনার মধ্যে ধরা হয় না বা আনা হয় না, আমি সেই বিষয়গুলো সমাধানের প্রশ্নেও নেতৃত্ব দিই। সেখানেও আমি তাদের গাইড করি, হেল্প করি এবং এইভাবে তাদের আমি সচেতন রাজনৈতিক কর্মীতে ট্র্যান্সফর্ম (পরিবর্তিত) করি, শুধু ইউনিয়ন করি না। ইউনিয়নও করি, আবার প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যা নিয়ে মাথাও ঘামাই। ডাকার অপেক্ষায় বসে

না থেকে প্রতিটি কাজ ও সমস্যার ক্ষেত্রে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি। ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলতে আমি একটি কর্মীর এই ধরনের টাইপ অব একজিসটেন্স (অস্তিত্ব) থাকা উচিত বলে মনে করি; অথচ উল্টো একটা মানসিকতাও আছে। অনেকে ভাবেন, হ্যাঁ, আমি নেতা লোক। আমাকে তো খবরই দেয়নি, তাহলে আমি কেন যাব? তাঁরা বলেন, আমাকে কি আপনারা খবর দিয়েছেন? আরে বাবা, আমাকে যদি খবর না দিয়ে থাকে সেটা অন্যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার জনগণের প্রতি যে দায়িত্ববোধ তা পালন না করে আমি তো আর একটা বাড়তি অন্যায় করলাম। ওর অন্যায় দেখিয়ে, তাদের পরিকল্পনার ত্রুটি দেখিয়ে একজন সচেতন কর্মী হিসাবে আমার কী অধিকার আছে — আমার নিজের যে জনগণের প্রতি দায়িত্ব আছে, যেটা কন্সট্যান্ট অ্যান্ড কনটিনিউয়াস (নিয়ত ও নিরবচ্ছিন্ন) — তাকে এড়িয়ে যাওয়ার? আমি সচেতন বলেই, বুঝেছি বলেই পার্টি বা ইউনিয়নের যে প্রোগ্রাম বা নীতি আমি জানি, সেই অনুযায়ী কেউ ডাকুক আর নাই ডাকুক, আমি তাদের প্রতি আমার যে দায়িত্ববোধ তা পালন না করে পারি না, তাদের সাহায্য না করে পারি না। একজিকিউটিভ, কর্মকর্তারা আমাকে যদি না ডাকে, তাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে যায়, প্রোগ্রাম না দিয়ে থাকে তাহলে অন্যায় তারা করল ঠিকই, কিন্তু তাদের কাজের ত্রুটি দেখানোর উদ্দেশ্য কি নিজের ত্রুটির যুক্তি খোঁজা, নিজের ত্রুটি চাপা দেওয়া? নাকি, আমি ত্রুটি দেখাচ্ছি এই কারণে যে, তাদের আমি ত্রুটিমুক্ত করতে চাই? নাহলে তো তাদের একটি ত্রুটি দেখিয়ে আমার মতো করে আর একটা অন্যায় করার অধিকার আমার নেই। আমার জনগণের প্রতি যে দায়িত্ব সেটা আমি পূরণ করব না কেন? এইসব জিনিসও ঘটে।

আরও একটি ত্রুটি হামেশাই কর্মীদের ক্ষেত্রে ঘটে, সেটা হচ্ছে দশ মিনিটের আলোচনায় যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার কথা, সেই আলোচনা আমরা দু'ঘণ্টা ধরে করি। একবার আলোচনায় বসলে আর উঠতেই চাই না। কাজের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করতে গিয়ে আলোচনায় বসে যত অকার্যকরী কথা একটার সঙ্গে আর একটা টেনে এনে কাজকে দ্রুততর বা পরিষ্কার করার পরিবর্তে অহেতুক আলোচনাকে টেনে টেনে বড় করে ফেলি। ফলে কী হয়? যে সময়টা আমরা কাজ করতে পারতাম, সেই সময়টা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করে, একে অপরের দোষ দেখিয়ে, পরস্পর তিক্ততা সৃষ্টি করে, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে আমরা কাটিয়ে দিই। আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগঠন করার ক্ষমতা এর দ্বারা খানিকটা মরতে থাকে। সেজন্য সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। আমাদের স্লোগান হবে, কন্সট্যান্ট কমন ডিসকাশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন, কন্সট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটি,

নিয়ত সম্মিলিত আলোচনা ও একত্রে চলা এবং নিয়ত একত্রে কাজ করা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেমন কাজ করা, আবার একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা। ছোটর সঙ্গে যেমন পারি, তেমনি বড়র সঙ্গেও একত্রে ঐক্য বজায় রেখে কাজ করতে পারি। সমানে সমানে পারি। এগুলো শিখতে হয়। এরই জন্য রেভোলিউশনারি ট্রেনিং। এই যে ট্রেনিং ক্যাম্প, ক্যাডার ক্যাম্পগুলো হয়, লেখাপড়া শেখার পরও, বিএ, এমএ পাশ করার পরও থিওরেটিক্যাল ট্রেনিং, ক্যাডার ট্রেনিং নিতে হয়, কোনও স্কুল-কলেজে পড়ে এগুলো শেখা যায় না। এগুলো হাতে-কলমে শিখতে হয়। শিখতে হয় — লোকের সঙ্গে পারস্পরিক তিক্ততা না করে কীভাবে একত্রে কাজ করা যায়। অপরে আমার সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে চাইলেই আমি আসব কেন? আমি তার শিকার বনে যাব কেন? আই মাস্ট নো অ্যান্ড লার্ন হাউ টু বাইপাস ইট, কী করে তা এড়িয়ে যেতে হয় তা আমার জানতে হবে, শিখতে হবে। অনেকে পিছল মাছের মতো স্লিপ করে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমার কাজ হচ্ছে সে বেরিয়ে যেতে চাইলেও কোনও না কোনও প্রকারে তাকে কাজের মধ্যে টেনে আনা, লড়াই-এর কর্মসূচি দেওয়া, এই গুণটি অর্জন করার নামই হোল সংগঠন-ক্ষমতা অর্জন করা; অথচ অনেক ক্ষেত্রেই উল্টো ব্যাপারটা ঘটে।

উনি আমাকে এই বললেন, তাহলে ওঁর সঙ্গে কাজ করা কীভাবে চলতে পারে? এ রকম হলে মানুষ কাজ করতে পারে? — ইত্যাদি নানা অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ, কে ঠিক আর কে বেঠিক, এই আলোচনা করতে করতেই সময় নষ্ট করলাম। কাজ ফেলে রেখে অযথা সময় নষ্ট করলাম, নিজের ক্ষমতাও নষ্ট করলাম, তাকেও কিছু করতে সাহায্য করলাম না। এর মানে, আমরা কখনও আলোচনাই করব না, এটা নয়। আলোচনা না করে আমরা এক পা-ও এগোতে পারব না। তাই আমাদের স্লোগান হবে — কন্সট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটি, কন্সট্যান্ট কমন ডিসকাশন। কিন্তু এই আলোচনাগুলি হওয়া চাই নৈর্ব্যক্তিক, বাস্তবসম্মত এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আলোচনা সংক্ষিপ্ত না হলে প্রিসাইজ না হলে, কাজের দিকে, ঐক্যের দিকে, ভাল বোঝাবুঝির দিকে না গিয়ে আলোচনা শুধুই অযথা বেড়ে যাচ্ছে — একথার মানে হল, যেদিক দিয়েই হোক, আমিই হই বা অপর পক্ষই হোক — আমরা কোনও পক্ষই এমন ক্ষমতাসম্পন্ন নই, যারা আলোচনাটাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করতে পারি। যেখানে আলোচনায় কথা বাড়ে, সেখানে বুঝতে হবে যে, আলোচনা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে সহজ বুদ্ধি খাটিয়ে আলোচনা বন্ধ করা উচিত। আলোচনা বন্ধ করে বলা উচিত, এসো, দু'কাপ চা খেয়ে নিই। তারপর

চলো এইবার কাজ করতে যাই। এটা না হয় মুলতুবি থাকল। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কেন না, এটা এমনিই টেনে টেনে বাড়ছে। যে জিনিস শুধু বাড়ে, কমে না, তা না করলেও চলে। চলো, হয় এই কাজটা করি, না হয় একটা জায়গায় ঘুরে আসি। এই যে সহজবুদ্ধি বা উপস্থিত বুদ্ধি, নিজের আলোচনার ঝোঁকটাও বুঝতে পারার ক্ষমতা, এ আমাদের প্রত্যেককে অর্জন করতে হবে। তবেই আমরা জনগণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারব।

না হলে, বন্ধু-বন্ধুর মধ্যে বোঝাপড়া নষ্ট করে ফেলবে। কমরেড-কমরেডের মধ্যে সমালোচনায় এনিমোসিটি (শত্রুতার মনোভাব) সৃষ্টি হবে। মতবিরোধ হলে, আপনার ভুলটা আমি একটু ধরিয়ে দিলে, আপনার মন খারাপ হয়ে যাবে। অথচ, আপনাকে সাহায্য করার জন্য, আপনার উপকারের জন্য ভুল ধরিয়ে দিলে মন খারাপ হবে কেন? ভুলটা ধরিয়ে না দিলে কী হত? একটা মিথ্যা সম্মান রক্ষা হত। কিন্তু আপনি তো ঐ ভুলের পথ বেয়েই আরও নিচে নেমে যেতেন। অথচ ভুল ধরিয়ে না দিয়ে আপনার সর্বনাশ করলে আপনি আরও বেশি খুশি? এ কী? এর মানেটা কী? এর মানে হচ্ছে, আপনার আত্মচেতনাই নেই। বিপ্লব দূরের কথা, সংগঠনের স্বার্থ তো দূরের কথা, আপনি নিজের ভালমন্দও ভাল করে বোঝেন না। মার্কসবাদ সেজন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে — বলেছে সমালোচক হচ্ছে শিক্ষক। বলেছে, শত্রুর কাছ থেকেও শেখো, লেম্যান-এর (সাধারণ মানুষের) কাছ থেকে শেখো। লে-ম্যান কি আপনারা যত কথা বলেন তা বলতে পারে? না তার অর্ধেকও বোঝে? তাহলে এই সব বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোক এই কথাগুলি বলেছে কেন? না, বলেছে এই কারণে যে, অনেক সময় একটা অজ্ঞলোক এমন কথা বলতে পারে যেটার মধ্যে স্টার্টলিং থিং (বিস্ময়কর জিনিস) থাকে, যা আপনার শেখবার বিষয়, আপনি এত কথা জেনেও যে কথাটা লক্ষ করেননি। চোখ-কান খোলা থাকলে সেই মুহূর্তে লেম্যান-এর ঐ কথাটি আপনার চিন্তার অনেক জিনিস পরিষ্কার করে দিতে পারে। কিন্তু ও কী বলবে — এই ভেবে যদি চোখ-কান বন্ধ রাখেন, মনের দরজা আটকে রাখেন তাহলে এই মুহূর্তে তার একটি কার্যকরী কথা, যা আপনার এত জ্ঞান সত্ত্বেও আপনার দৃষ্টিশক্তিকে খোলেনি, তা আপনার জানার বাইরে থেকে যাবে। এতে আপনারই ক্ষতি।

তাই সর্বদাই চোখ-কান খোলা রাখো, পঞ্চেন্দ্রিয় খোলা রাখো। শেখবার কিছু হলে সে শত্রুই বলুক, মারবার মুহূর্তেই বলুক, মারতে মারতেই বলুক, শিখে নাও। এইভাবে নিজেকে খোলা রাখো, পরিবর্তিত করো। যে সমালোচক, সে হয়ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সমালোচনা করল। কিন্তু ভেবে না বললেও যে কথাগুলি সে বলেছে, একটু খোঁজ করে দেখি, যদি তার থেকে আমার নিজেকে

কিছু শোধরাবার থাকে। মোটিভেটেড ওয়ে-তে বললেও, মোটিভ-টা না হয় পরেও ফাইট করা যেতে পারে, কিন্তু সেই মুহূর্তে মোটিভ-টাই যদি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে তাহলে তার মধ্যে কিছু সত্য থাকলে তা আমার নজরের বাইরেই থেকে যাবে। এইটাই হচ্ছে সমালোচনাকে ও সমালোচককে নেওয়ার ক্ষেত্রে, গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেইজন্য সমালোচকও শিক্ষক। এইসব আমার কথা নয়। ভাববেন না যে, এই শিবদাস ঘোষ লোকটা সব বানিয়ে বানিয়ে নিজের মতো করে, প্রিচার-এর মতো করে এসব বলছে। আপনারা মার্কসবাদ ভাল করে পড়বেন। ঐ সব চটি বই নয়। একদল তথাকথিত মার্কসবাদী নেতা আছেন যাঁরা ঐ সব চটি চটি বই পড়েন, সেগুলি নয়। থরোলি (গভীর ও সম্পূর্ণতার সঙ্গে) মার্কসবাদ পড়ুন, জানুন। তার এথিকস, ভ্যালুজ, ফিলজফি-র (নীতি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ, দর্শন) খোঁজ খবর নিন। নিলে দেখবেন আমি যা বলছি, এগুলিই হল তার সার কথা। মার্কসবাদকে এভাবে না বুঝলে মনে হবে, যেন না খেতে পাওয়া, অভাব বা দুঃখ-কষ্ট থেকেই লোকে মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। খেতে পায়নি বলে মার্কসবাদী হয়েছে — ব্যাপারটা এমন নয়। সকল দেশেই, এ যুগে যারা বড় মানুষ, চিন্তাশীল, দরদী মনের মানুষ, মানুষের প্রতি অসীম মমত্ববোধ থেকেই তাঁরা মার্কসবাদের প্রতি ঝুঁকেছেন। তাঁদের অনেকেরই ঘরে খাওয়া-পরার অভাব ছিল না। এমনকী শোষকের ঘরে, জোতদারের ঘরে, ধনী পরিবারে জন্ম তাঁদের অনেকেরই। যেমন মাও সে-তুঙ, এঙ্গেলস এবং অনেকেই, এঁদের কারোরই ঘরে অভাব ছিল না। শুধু এথিকস-এর জন্য, নোব্‌ল অ্যান্ড হায়ার ইডিয়লজি-র (মহৎ এবং উন্নত আদর্শের) জন্য, ভ্যালুজ-এর জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘেঁটে, এর চেয়ে মূল্যবান, মহৎ, বড় জিনিস আর খুঁজে পাননি বলেই তাঁরা মার্কসবাদী হয়েছেন। খেতে না পেলে লোকে মার্কসবাদী হয় — মার্কসবাদের আবেদনটা এরকম নয়। একটা আমেরিকান 'লবি' গ্রো করেছে (গড়ে উঠেছে), একদল টেকনোক্র্যাটস, এক্সপার্টস (কারিগরি বিদ্যার বিশারদ), তারা আমেরিকার রাজনীতিবিদ্‌দের বোঝাচ্ছে যে, এই মানুষগুলোর দুঃখ-দুর্দশাই হচ্ছে লালঝান্ডাওয়ালাদের বিপ্লব-টিপ্লবের আসল কারণ। বিপ্লবকে মেরে দেওয়া যায় যদি এই লোকগুলোকে অ্যালসেশিয়ান বানিয়ে দেওয়া যায়। একটু ভাল করে খেতে পরতে দাও, অ্যাফ্লুয়েন্ট কন্ডিশন অব লাইফ (জীবনে প্রাচুর্য) এনে দাও, দুটো নাইট ক্লাব খুলে দাও, ড্যাকা ড্যাং-এর বন্দোবস্ত করে দাও — হোক না মজুর, দেখবে বিপ্লব-টিপ্লব কিছু নয়। কিন্তু খোদ নিজের দেশেই তারা লক্ষ করছে না যে, সমস্ত দেশের জনসাধারণকে, যুবকদের একটা যুগ ধরে দুটো ড্যাকা ড্যাং আর 'ইট, ড্রিংক অ্যান্ড বি মেরি'-র (খাও দাও ফুর্তি করো) স্লোগানে মাতিয়ে রেখেও জনগণের আন্দোলনমুখীনতাকে তারা

মেরে দিতে পারছে না। আমেরিকার চেহারা পাল্টাচ্ছে। ভিয়েতনামে বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে, মানবতাকে লুণ্ঠন ও ধর্ষণ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে খোদ আমেরিকার জনসাধারণ আজ তাদের সরকারের বিরুদ্ধে গোটা দুনিয়ার মানুষের বিক্ষোভের মিছিলে সামিল হচ্ছে, তাদের হাতে হাত মেলাচ্ছে।

তাই যে কথা বলছিলাম, এই যে সমস্ত জিনিসগুলো আপনাদের ঘটে, এই সমস্ত জিনিসগুলোকে সামনে রেখে সংগঠন বাড়াবার ক্ষেত্রে আপনাদের দুটো কথা ভালভাবে বুঝতে হবে, মনে রাখতে হবে। এক হল, সংগঠন একটা আলাদা প্রশ্ন নয়, বিনা রাজনীতিতে সংগঠন বাড়াবার চেষ্টা হলেও কোনও কারণে যদি কখনও ব্যক্তির উদ্যোগ, একটা লোকের বা কতকগুলো লোকের সততা বা স্যাক্রিফাইস-এর ফলে মানুষজনের দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়ে বা এরকম কতকগুলো ঘটনাকে কেন্দ্র করে আপনারা আপনাদের সংগঠন বাড়িয়েও তোলেন, আপনারা তা টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। অ্যাপলিটিক্যাল (রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিবর্জিত) সংগঠন টিকে থাকে না, থাকবেও না। তাহলে আমরা যে সংগঠন করি তার রাজনীতিটি কী তা বুঝতে হবে। আর, বুঝতে হবে এই রাজনীতির দুটো দিক আছে — একটি অ্যাকটিভ পার্টি পলিটিক্স-এর দিক, আর একটা হচ্ছে যদি কেউ পার্টি পলিটিক্স করা পছন্দ নাও করে, তবুও রাজনীতি সঠিক কি বেঠিক এটা তাকে নির্ধারণ করতেই হবে। এটাকে বাদ দিয়ে মজুর আন্দোলন, মজুর সংগঠন, মজুরদের বিপ্লবী লড়াই কোনওটাই চলে না। এগুলো শুধু ফাঁকা কথাই নয়, এভাবে ভাবলে মারাত্মক ভুল হবে। এর ফলে কোন কিছুই গড়ে উঠবে না, এটা একটা, কী বলব, সেলফ-ডিসেপশন, খানিকটা নিজেকে ঠকানো।

সকল মজুরকে খোলাখুলি বলতে হবে — বাবা, রাজনীতি করাটা এত সোজা জিনিস নয়, বিপ্লবী রাজনীতি তো নয়ই। এমনি রাজনীতি করাও সোজা জিনিস নয়। রাজনীতির নামে বাঁদরামি করা সোজা জিনিস হতে পারে, কিন্তু সরাসরি সারা জীবন ধরে রাজনীতি করবে, এটা একটা সহজ জিনিস নয়। তা, তুমি তার জন্য এত উদ্বিগ্ন কেন? রাজনীতি করা একটা জিনিস, আর রাজনীতি সঠিক কি বেঠিক, সেটা বোঝবার চেষ্টা করা এবং সেই অনুযায়ী কোন রাজনৈতিক লাইন ধরে চলব তা ঠিক করা আর এক জিনিস। সেটা ঠিক করলেই কারোর রাজনীতি করতে হয় না। অথচ সেটা ঠিক না করলে কোনও লড়াই, কোনও মানবিক লড়াই আজকের দিনে হতে পারে না, কোনও সংগঠনই দানা বাঁধতে পারে না — দ্যাট ইজ এ মিথ্ অব অর্গানাইজেশন (সেটা হল সংগঠন সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা)। ফলে এ দুটো জিনিস তাদের কাছে পরিষ্কার

হওয়া দরকার। তাদের বলা দরকার, এত ভয় পাচ্ছ কেন? পার্টি পলিটিক্স-এর কথা শুনলে এত ভয় পেয়ে যাও কেন? জোর করে কাউকে পার্টি করানো যায় কি? বিপ্লবী পার্টি তো করানো যায়ই না। যতক্ষণ না বুঝছ, তোমার উদ্বিগ্ন হবারও প্রয়োজন নেই, দরকারও নেই। কিন্তু একটি জিনিস অবশ্যই দরকার, আর তা হল, রাজনীতি তোমাকে বুঝতেই হবে। তুমি যদি বল, না, না, রাজনীতি বোঝবার দরকার নেই, তাহলে তুমি না বুঝলেও, রাজনৈতিক স্থিতি এবং চিন্তাভাবনা, যা ভুল, তা যদি দেশে চলতে থাকে এবং তার প্রভাব যদি বাড়তে থাকে তাহলে, যে তুমি রাজনীতি থেকে গা বাঁচাতে চাইছ, সেই তুমি তোমার চিন্তা-ভাবনা, রুচি, সংস্কৃতি, পরিবার এমনকী যে সংগঠনটি তোমরা এখানে খাড়া করতে চাও, সে সবই তো সেই ভুল রাজনীতির প্রভাবে বরবাদ হয়ে যাবে, তাকে তুমি রক্ষা করতে পারবে? এভ্রি মুভমেন্ট ইজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই পলিটিক্স, প্রতিটি আন্দোলনই রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত। তার প্রভাব থেকে খাদ্য থেকে শুরু করে সব কিছু, মেডিসিন পর্যন্ত মুক্ত নয় — আপনি নিজেকে আলাদা রাখবেন কী করে? ইউ আর এ সোস্যাল বিয়িং (আপনি সামাজিক সত্তাবিশিষ্ট মানুষ)। সংগঠনের কথা তো বহু দূর, এর একটি ব্যক্তি মানসিকতা পর্যন্তও তার থেকে মুক্ত রাখার উপায় নেই। আপনি ভাবতে পারেন, আমি আলাদা থাকব; এ সম্পর্কে আপনি অনবহিত থাকতে পারেন। আপনার চিন্তা-ভাবনা এরকম থাকতে পারে যে, আমি কারোর সঙ্গে, কারোর সংস্পর্শে নেই। এর মানে হোল আপনি অনবহিত। আপনি জানেন না কীভাবে আপনি সমাজের সঙ্গে প্রতিনিয়তই সম্পর্কিত হচ্ছেন, কীভাবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ আপনার মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করছে, আপনার সংগঠনের মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করছে, সংগঠন পরিচালনার কায়দার উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এই যেটাকে বলছেন, স্টাইল অব অর্গানাইজেশন, সংগঠন পরিচালনার পদ্ধতি বা কৌশল, এই স্টাইল অব অর্গানাইজেশন কথাটার মধ্যেও বুর্জোয়া ভাবনা-ধারণা, প্রোলেটারিয়েটের বিপ্লবী ভাবনা-ধারণা প্রতিফলিত হয়।

যেমন ধরুন একটা ইলেকশন এসে গেছে, তার লড়াই লড়বেন। আপনি ভাবছেন — এটা নির্বাচন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছেন, এর মধ্যে আবার বিপ্লবী রাজনীতির কী আছে? আপনার ধারণা হচ্ছে, কংগ্রেসকে পরাস্ত করার যে কোনও কৌশলটাই বিপ্লবী। না। ইলেকশনে কংগ্রেস একটা পক্ষ, বিপক্ষ দল আর একটা পক্ষ, তার মধ্যে জনসাধারণ এসে যাচ্ছে।

যতদিন বিপ্লব না হয়, জনতা ইলেকশন চাক বা না চাক, পছন্দ করুক

আর নাই করুক, ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, জনতাকে টেনে আনা হয়, জনতা এসে যায়। বিপ্লব মানে হল, যখন জনতা বুঝে ফেলেছে ইলেকশন-এর প্রয়োজনীয়তা নেই, যখন সকলে এই চেতনার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে গেছে এবং সংগঠিত ভাবে ইলেকশন বর্জন করছে, নেগেটিভলি বর্জন করছে না, পজিটিভলি তারা আপরাইজিং গণঅভ্যুত্থান করার জায়গায় চলে গেছে, যখন সে বলে, না ইলেকশন নয়, ক্ষমতা দখল, তখনই একমাত্র ইলেকশন অকার্যকরী হতে পারে, না হলে ইলেকশনে জনতা বার বার ফেঁসে যায়। আর জনতার সঙ্গে থাকবার জন্য বিপ্লবী হোক, অবিপ্লবী হোক সকলকেই ইলেকশন-এ যেতে হয়, সত্যিকারের বিপ্লবীকেও যেতে হয়। শুধু ঐসব সেকটেরিয়ান ট্রুইজম-এর চর্চা যারা করে, যারা বিপ্লবের চর্চা করে না, তারা গা বাঁচায়, না হলে সকলকেই যেতে হয়। তাহলে গেলে সকলের কি দৃষ্টিভঙ্গি এক হবে? ইলেকশন তো সকলেই করছে, বাইরের দিক থেকে দেখলে, আমি করছি, বিপ্লবী লেনিনবাদীরাও করছি, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাও করছে, খাঁটিরাও করছে, মেকিরাও করছে, বুর্জোয়ারাও করছে, মেকি সমাজতন্ত্রীরাও করছে। আর সকলেরই কথা হবে আমি ঠিক, বিপক্ষ দল বেঠিক। তাহলে বিপক্ষ দলকে হারাবার জন্য যে কোনও কৌশলটাই হচ্ছে সঠিক, কারণ আমি সঠিক। এইভাবে যদি আপনি যুক্তি করতে থাকেন, তাহলে বুর্জোয়া আর আপনার মধ্যে কোনও শ্রেণীগত পার্থক্য থাকে না, দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য থাকে না, অথচ গভীর বিচার-বিশ্লেষণে এটা ভুল প্রমাণ হয়।

আসলে বুর্জোয়া আর প্রোলেটারিয়েট এ দু'জনেরই লড়াইয়ের কলা-কৌশল, কায়দা, সংগঠন পদ্ধতি, ইলেকশন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি, জেতা-হারার কলা-কৌশলটি ঠিক করাও দেশের বাস্তব বিপ্লবী আন্দোলন, গণচেতনার স্তরের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। বুর্জোয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচনী আসন দখল করা এবং করে ক্ষমতায় যাওয়া। ক্ষমতায় গিয়ে নানা রিফর্মস (সংস্কারমূলক কাজ) করে, নানা স্লোগান তুলে এই এগ্‌জিসটিং সিস্টেম-কেই (বর্তমান ব্যবস্থা) টিকিয়ে রাখা। যেমন করে বললে আমি জনতার মধ্যে প্রগতিশীল সেজে কিছু দিন তাকে বিভ্রান্ত করতে পারি, বোকা বানাতে পারি এবং এই ব্যবস্থাটাকেই দীর্ঘস্থায়ী করতে পারি — এ হল তাদের উদ্দেশ্য। তাহলে তার মূল লক্ষ্য হয়, যেভাবেই হোক সর্বাধিক নির্বাচনী আসন দখল কর। এটা ছাড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি, আশু কর্মসূচি এগুলোও সে দেয়। এই প্রোগ্রাম ও স্লোগান তাদের যাই হোক, তাদের মূল কথা হচ্ছে, গ্র্যাব ম্যাক্সিমাম সিটস।

আর বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতার লক্ষ্য থেকে প্রোলেটারিয়েট যখন অনন্যোপায় হয়ে জনতার সঙ্গে থাকার জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে যায়, তখন সে একটা জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে যায়। সিট জেতবার জন্য সেও চেষ্টা করে সাধ্যমতো। কিন্তু তার উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দুটা কখনই যেভাবেই হোক সর্বাধিক আসন দখল করা হয় না। তার মেইন ফোকাল পয়েন্ট-টা হয়, পিপ্‌ল-কে, জনতাকে, একটা মাস রেভোলিউশনারি লাইন-এর (জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের) ভিত্তিতে ইলেকশন লড়াই করতে শেখানো এবং এইটা করতে গিয়ে ম্যাক্সিমাম সিট পাই পাব, যদি না পাই, একটাও না পাই, না পাব। যদি দশটা রক্ষা করতে পারি, দশটাই করব, কিন্তু তার সেন্ট্রাল ফোকাল পয়েন্ট কখনই হবে না — যেন তেন প্রকারেণ, যে কোনও উপায়ে কতকগুলো সিট গ্র্যাব করা।

হোয়াট ইজ দ্যাট মাস লাইন অ্যান্ড মাস স্টাইল অব অ্যাক্টিভিটি? জনতার সেই বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতিটি কী, যেটা ইলেকশন-এ জনসাধারণের কাছে আমি নিয়ে যাব? জনতার মধ্যে আমি যাব এই কথা নিয়ে — তুমি যখন ইলেকশন করছই তখন পিপ্‌ল-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোমাকে বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে ইলেকশন করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে তোমার নিজের ঘাঁটিগুলি তুমি নিজে সামাল দাও। যে কয়টা সিট পাও, যতগুলো ম্যাক্সিমাম পার, এমনকী যদি সব সিটই জিততে পার, এর ভিত্তিতে এই লাইনের ভিত্তিতেই জেত। কিন্তু একমাত্র এর ভিত্তিতেই, এটাকে গোলমাল করে দিয়ে নয়। শত্রুকে হারাবার জন্য যা দরকার তাই কর — এসব যুক্তি যদি তুমি তোল, আর বিপ্লবী তক্‌মা এঁটে তোল, তাহলে কিন্তু বুর্জোয়ারা যেভাবে ইলেকশন ফাইট করে, তুমিও আসলে সেই কৌশলটি, সেই কায়দাটি এবং সেই একই ট্যাকটিক্সটাকেই বিপ্লবের নামে চালু করার চেষ্টা করবে। এতে কি বিপ্লবী হওয়া যায়? এর দ্বারা কি বিপ্লবের কাজ এগোয়? না, এতে বিপ্লবী হওয়া যায় না এবং এর দ্বারা বিপ্লবী কাজও এগোয় না। এর ফলে, আমরা যে বলি ইলেকশন-এর মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি পলিটিক্সকে এক্সপোজ করব, তা হয় কি? এই কথাটা মুখে বলা আর কাজে করা এক জিনিস নাকি? একদল শুধু মুখে বলে, আর একদল বাস্তবে করে। কাজেই কারা এটা শুধু মৌখিকভাবে বলছে, আর কারা প্রকৃতই সেই অনুযায়ী কাজ করছে, এ সম্পর্কে পিপ্‌লকে, জনতাকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করাটাই হল আসল জিনিস।

যেমন আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যের কথা সকলেই বলছে, কিন্তু কে শুধু বলছে আর কে ঐক্যের জন্য যা যা করা দরকার সেই অনুযায়ী কাজ পারুক না

পারুক করছে, সেটা জনসাধারণকে দেখান, দেখান আর একদল ঐক্যের কথা বলছে কিন্তু বাস্তবে করছে যা, সেটি ঐক্য বিনষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। আর জনসাধারণকে একথাটি বোঝান, দুটো জিনিসের জন্যই ঐক্য তোমার দরকার। নিজের সংগঠনকে জোরদার করার জন্য ঐক্য দরকার, আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ঐক্য দরকার। আবার ঐক্য দরকার বিপ্লবী রাজনীতিকে পরিষ্কার করার জন্য, মেকি রাজনীতি থেকে মোহমুক্তি ঘটাবার জন্য। সমাজে মোহমুক্তি ঘটাবার প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন দরকার, ফলে ঐক্য দরকার। কিন্তু এই ঐক্য নীতি বিসর্জন দিয়ে নয়, সংগ্রাম বর্জন করে নয়। ঐক্যের মধ্যে আদর্শের সংগ্রামের স্বীকৃতি চাই। যারাই ঐক্যের মধ্যে আদর্শের সংগ্রামকে ঐক্যবিরোধী কাজ বলে তারাই শেষ পর্যন্ত ঐক্য নষ্ট করে। আদর্শের রফা হয় না ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য — এ হতে পারে না। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দোহাই দিয়ে আদর্শ কমপ্রোমাইজ করলে সে ঐক্য থাকে না। সে ঐক্যের একটিই মানে — আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কোনও একজনের পদলেহন করা। তা না হলে, ঐক্যের মধ্যে যে সংগ্রাম রয়েছে, সেটিকে জনতার সামনে তুলে ধরতে হবে। সেটিকে তুলে ধরে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত উদ্যোগ নিয়ে আর স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনাদের গণসংযোগ বাড়িয়ে যেতে হবে, পিপ্‌লস ইনস্ট্রুমেন্ট অব স্ট্রাগ্‌ল, জনতার নিজস্ব লড়াইয়ের হাতিয়ার গড়ে তুলতে হবে, আর তারই মধ্য দিয়ে পিপ্‌লস পলিটিক্যাল পাওয়ার, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। এ যদি করে যেতে পারেন তবে বিপ্লব একদিন আসবেই, ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম কেউই ঠেকাতে পারবে না, আপনাদের ইনকিলাবের স্বপ্ন একদিন সফল হবেই।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ